রত্নপুরী
শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য

উপহার

সূচীপত্র

রত্নপুরী

রত্নপুরী

শীতের সন্ধ্যা। রাস্তাঘাট বরফে ছাওয়া। দরজা জানালা বন্ধ। যে ছু' একটা খড়খড়ির পাখী খোলা আছে তারই মধ্যে দিয়ে কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক আসছে। তবু বৃদ্ধ সৈনিকের ঘরে ছোটদের সান্ধ্য আসরের সভ্যগুলি সবই উপস্থিত।

অগ্নিকুণ্ডের চারধারে ছেলেরা ভীড় ক'রে ব'সেছে। বৃদ্ধ সৈনিক ব'লে চলেছে দেশ-বিদেশের আজব গল্প। শিশুরা চুপটি ক'রে একমনে তার মুখের দিকে চেয়ে শুনছে।

"দেশের নাম রত্নপুরী। সেখানকার ঘর-বাড়ী সব মণি-মাণিক্যে তৈরী। জমাট রূপোয় বাঁধান মেজে। জানালায় ঝুলছে মুক্তার ঝালর। ঘরের খাট-পালঙ্কে হীরা বসান।

রাজপথে যে ধুলো জমে সে ধুলো ধুলো নয়, সে হচ্ছে সোনা-রূপো মণি-মাণিক্যের গুঁড়ো। ঝাড়ুদার গাড়ী বোঝাই

ক'রে এই সব রত্নধূলি রত্নপুরীর বাইরে ফেলে দিয়ে আসে। তাই রত্নপুরীটি সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ঝক্‌ঝকে-তক্‌তকে।"

শ্রোতাদের মধ্যে একজন আর কৌতূহল সংবরণ করতে পারলে না। সে উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, সেখানে মানুষ যেতে পারে?"

যে ছেলেটি এই প্রশ্ন করলে তার নাম রুপার্ট। বৃদ্ধ সৈনিক বললে—"তা' পারে, কিন্তু সে পথ বড় সহজ নয়।"

—"সহজ না-ই বা হ'ল। আপনি বলুন কোন্ দিকে তার পথ।"

ছেলেরা তখন ঠাট্টার সুরে বললে—"কেনরে রুপার্ট, তুই কি রত্নের লোভে রত্নপুরী রওনা হচ্ছিস্ নাকি?"

রুপার্ট তাদের কথার জবাব না দিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে—"আচ্ছা, সেখানে যদি কেউ যায় তা' হ'লে সে তো অনেক রত্ন নিয়ে আসতে পারে?"

—"খুবই পারে। হীরা-জহরতের তো সেখানে ফেলা ছড়া। যে যত পারে নিক্ না কেন—তাদের কোন আপত্তি নেই। তবে ঐ যে বল্লুম—যাওয়াই কঠিন।"

—"কিন্তু কেন কঠিন তা'তো বললেন না।"

—"কত পাহাড়-পর্ব্বত, কত বন-জঙ্গল, কত মরুভূমি, কত নদী-নালা পার হ'য়ে কি ক'রে যে সে দেশে যাওয়া যায় তা'

যদি শোন তা' হ'লে আর রত্নপুরী যাওয়ার উৎসাহ থাকবে না। কত লোক যে সেখানে যাবার চেষ্টা ক'রেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পৌঁছতে পারেনি একজনও।"

রুপার্ট অধীর হ'য়ে বললে—"তা' হোক। আপনি এখন পথটা দেখিয়ে দিতে পারেন কি না, সেই কথা বলুন।"

—"পারি খুবই। কিন্তু ভয় হয় পাছে বিপদে পড়।"

—"কেন, বিপদ্ আবার কিসের?"

—"সে পথ বড় ভয়ঙ্কর। তবু তুমি যদি নিতান্তই যেতে চাও তো কয়েকটি কথা ব'লে দিই, মনে রেখো।"

রত্নপুরীতে যাবার ছুটি পথ। একটি পথ খুব দীর্ঘ, কিন্তু প্রশস্তও কম নয়। তার গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত কাঁকর বিছান। চলতে গেলেই মনে হবে যেন ধারাল ছুরির ডগার উপরেই পা পড়ছে। পথে বাঘ ভালুক আছে, আরও কত হিংস্র জীব আছে—তাদের হাতে পদে পদে প্রাণ যাবার সম্ভাবনা। চোর ডাকাতেরও অভাব নেই—তা'রা বাঘ ভালুকের চেয়ে আরও নিষ্ঠুর। পথে কোনদিন হয়তো আহার জুটবে, কোনদিন জুটবে না। তা' ছাড়া জল-ঝড়, শিলাবৃষ্টি—এসব প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ এলে কোথাও একটু মাথা গোঁজার ঠাঁইও মিলবে না। একদিন আমিও তো বেরিয়েছিলাম।"

—"আপনিও গিয়েছিলেন ?"

—"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বই কি ?"

—"রত্নপুরী তা' হ'লে দেখে এসেছেন ?"

—"পথে পা দিয়েই একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখেই পথের বিবরণ শুনে আর যাবার ভরসা হ'ল না। তখনই ফিরে পড়লাম।"

—"আচ্ছা, তার পর বলুন। যদি এসব বিপদ-আপদ পেরিয়ে কেউ যেতে পারে তা' হ'লে তো রত্নপুরী পৌঁছতে পারবে ?"

—"তা' পারবে, কিন্তু তখন পথশ্রমে তার শরীর হ'বে জীর্ণ। কত বছর ধ'রে যেতে হবে তার কি কিছু ঠিক আছে ? বিশ, ত্রিশ, চল্লিশ হয়তো বা আরও বেশী। তখন মাথার চুল যাবে পেকে, কপালে পড়বে বার্দ্ধক্যের রেখা, চোখের দৃষ্টি হবে ঝাপসা, কানে শুনবে কম। এমনি ধারা অচল দেহ টেনে টেনে লাঠি ভর ক'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে যদিই বা কেউ পৌঁছয় তো তার লাভ কি ? এমনি থুত্থুড়ে বুড়ো বাঁচবে ক'দিন ?— আর সে ঐ রত্ন নিয়েই বা করবে কি ? তবে হাঁ, আর একটা পথ আছে বটে, সেটি তেমন দীর্ঘ নয়। তা' ছাড়া সে পথটি বেশ সমতলও বটে কিন্তু……"

—"কিন্তু আর কিছুই নেই এর মধ্যে। আমি ঐ পথেই

যাব। আপনি শুধু একটিবার আমায় দেখিয়ে দিন, কোন্ দিকে যেতে হবে।"

—"তা' দেখিয়ে দেব; কিন্তু আমার কথাটা তো শোন শেষ পর্য্যন্ত।"

—"না, যা' শোনার আমি শুনেছি। আর কিছু শুনতে চাইনে আমি। শুধু ব'লে দিন কোন্ দিকে গেলে রত্নপুরীর পথ পাব।"

"বেশ তবে তাই যাও"—এই ব'লে বৃদ্ধ সৈনিক একদিকে আঙ্গুল বাড়ালেন। রুপার্ট কাউকে কিছু না ব'লে পাগলের মত বেরিয়ে পড়ল। রত্নপুরীর চিন্তায় সে একেবারে তন্ময়।

চলতে চলতে সে ঘর-বাড়ী, মা-বাবা, ভাই-বোন সকলের কথা ভু'লে গেল। তার মনের মধ্যে ভেসে উঠল সেই রত্নপুরীর ছবি। চুণি-পান্না হীরা-জহরতে ঝলমল করছে সারা দেশটা। তাদের ছটায় চোখ ঝলসে যায়। তার মনে হ'ল রত্নপুরী পৌঁছতে আর বেশী দেরি নেই।

দু'রাত হেঁটে হেঁটেই কাটল—রুপার্টের সে দিকে [illegible] নেই। তিন দিনের দিন সকালে সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকাণ্ড নদীর তীরে এসে সে দেখতে পেল তার চলার পথ শেষ হ'য়েছে। সামনে নদী, সে নদীতে ভীষণ ঢেউ।

ঘাটের কাছে একটা খুঁটিতে বাঁধা একটি খেয়া নৌকো।

নৌকোর হালে দাঁড়িয়ে একজন কাফ্রী মাঝি। কি ভীষণ তাব চেহারা! আলকাতবার মত কাল তার গায়ের রং। চোখ-গুলো লাল, ঠোঁটদুটো পুরু। সব মিলে মুখখানা এমনি বীভৎস যে; দেখলে ভয় করে।

রুপার্ট তার কাছে গিয়ে বললে—"বলতে পার মাঝি, রত্নপুরীর পথ কোন্ দিকে?"

"ঐ ওদিকে" ব'লে মাঝি নদীর ওপারের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখালে।

রুপার্ট বললে—"নদীর ওপারে?"

—"হাঁ।"

—"আমায় পার ক'রে দেবে মাঝি ?"

—"পারে যেতে হ'লে কি লাগে জান ?"

—"না, কি লাগে তুমিই বল না।"

—"পঞ্চাশ ডুরো। দিতে পারবে ?"

—"পারব কি না আমায় দেখেই তো তুমি বুঝতে পারছ। দেওয়া তো দূরের কথা, পঞ্চাশ ডুরো কখনও একসঙ্গে চোখেও দেখিনি। তোমার পায়ে পড়ি মাঝি, আমায় তুমি দয়া ক'রে পার ক'রে দাও।"

কাফ্রী তার কথা শুনে বললে—"এ নদী তেমন নদী তো নয়! বিনা পয়সায় কেউই পার হ'তে পারে না। সাঁতার কেটে যাবে, তারও উপায় নেই। দেখছ তো কি ভীষণ ঢেউ! তার ওপর হাঙ্গর কুমীরও ঢের আছে।"

—"তবে আমার উপায়! এতদূর এসে খালি হাতেই ফিরব ?"

নিতান্ত হতাশভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রুপার্ট সেই নদীর তীরে বালির উপর ব'সে পড়ল।

মাঝি তখন বললে—"তা' দেখ নৌকো ভাড়া তোমার যদি না থাকে, তুমি তার বদলে কিছু দাও।"

—"তা'তে আমি খুবই রাজী। কিন্তু পঞ্চাশ ডুরোর বদলে

কি দেব ? আমার এই ময়লা ছেঁড়া পায়জামা আর জামা, এইতো আমার সম্পত্তি। এর বেশী তো কিছুই নেই।"

—"বেশী থাকলেও তা' আমি নিতাম না। এক কাজ কর। তোমার বুকের মধ্যে যে হৃৎপিণ্ড আছে তারই একটুক্রো আমায় কেটে নিতে দাও। প্রথমে তা'তে হয়তো একটু ব্যথা পাবে। কিন্তু কিছুদিন পরে সব ঠিক হ'য়ে যাবে,—মনে হবে যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে।"

রুপার্ট বললে—"তাই নাও। কিন্তু রত্নপুরী আমার যাওয়া চাই-ই।"

কাফ্রী মাঝি তখন তার হৃৎপিণ্ডের এক টুক্‌রো কেটে নিলে। বুকের ওপরে কিন্তু কোন চিহ্নই রইল না।

রুপার্ট নদীর ওপারে পৌঁছে যেই মাটিতে পা দিলে অমনি রত্নপুরীর চূড়া তার নজরে পড়ল। কি উঁচু, কি উজ্জ্বল, কি আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর সে চূড়া! রঙ-বেরঙের পাথরে সে চূড়া তৈরী! তা'তে রোদ লাগায় মনে হচ্ছে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে। উঃ, ওদিকে তাকালে চোখ যেন ঝলসে যায়। কিন্তু কই তেমন আগ্রহ তো আর নেই। যে আগ্রহ নিয়ে রুপার্ট গ্রাম ছেড়ে, মা-বাবাকে ছেড়ে এতখানি রাস্তা হেঁটে এসেছে সে আগ্রহ তার গেল কোথায় ? যে রত্নপুরীর জন্যে সে বুক খালি ক'রে হৃৎপিণ্ড কেটে দিলে, কই তার জন্যে মন ত

আর তেমন ক'রে টানছে না। তবু সে এগিয়ে চলল। বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে যখন, তখন যাওয়া তার চাই-ই। রত্নপুরী না দেখে সে ফিরবে না।

খানিক দূর গিয়েই রুপার্ট দেখলে সামনে দুটি প্রকাণ্ড পর্ব্বত। তাদের মাঝখান দিয়ে একটি সরু রাস্তা। আর সেই রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে একজন কাফ্রী প্রহরী। তার চেহারা মাঝির চেয়েও ভীষণ। দেখে মনে হয় যেন কষ্টিপাথরে গড়া একটা মানুষের মূর্ত্তি। সে দু'হাতে রুপার্টের পথ রোধ ক'রে জিজ্ঞেস করলে—"কোথা যাও ?"

রুপার্ট উত্তর দিলে—"রত্নপুরী।"

—"তা' হ'লে ঠিক রাস্তাতেই এসেছ। কিন্তু এপথের পাথেয় হৃৎপিণ্ডের একটি টুক্‌রো—তা' জান তো ?"

রুপার্ট ভাবনা চিন্তা না ক'রেই বললে—"বেশ তা' নাও।"

রুপার্ট বুক ফুলিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়াল। প্রহরী তার প্রাপ্য পাথেয় নিয়ে পথ ছেড়ে দিলে। রুপার্ট আরও এগিয়ে চলল। রত্নপুরীর সিংহদ্বার ঐ যে দেখা যায়। একি সত্য ! এত সুন্দর দেশ ! এযে ছবির চেয়েও সুন্দর !

সুন্দর খুবই কিন্তু তবু রুপার্টের উৎসাহ ক্রমশঃ নিভে আসছে। মনে হচ্ছে—গিয়ে আর কি হবে ?

তবু সে চলল। কিছুদূর যেতে না যেতেই দেখলে সেই

সঙ্কীর্ণ পাহাড়ে পথ ঢালু হ'য়ে যেন নীচের দিকে নেমে গেছে। তাকিয়ে দেখে কোথায় বা পথ আর কোথায় বা কি ? একবার সেখানে পড়লে আর উদ্ধার নেই। রুপার্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল—কেমন ক'রে এ খাদ পেরোন যায়।

এমন সময় একটা শকুনি উড়ে এসে তার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। রুপার্ট মুখ তুলে তাকাতেই সে বললে—"তুমি বুঝি রত্নপুরীর যাত্রী ?"

—"হাঁ।"

—"তা' আমায় যদি একটুক্‌রো হৃৎপিণ্ড দাওতো আমি তোমায় এই গভীর খাদ পার ক'রে রত্নপুরীতে পৌঁছে দিতে পারি। রাজী আছ ?"

রুপার্ট বললে—"আছি।"

অমনি সেই শকুনি তার বুকে ঠোঁটের ঠোকর দিয়ে আর খানিকটা টুক্‌রো বের ক'রে নিলে। তারপর তার পা দিয়ে রুপার্টকে ধ'রে এক নিমেষের মধ্যেই খাদ পার ক'রে রত্নপুরীর দেউড়িতে নামিয়ে দিলে।

এতদিন রুপার্টের কল্পনায় যে কল্পলোকের ছবি ভাসছিল আজ তা' রূপ ধ'রে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। শুধু ঐশ্বর্য্য দিয়ে যদি মানুষ সুখী হয় তা'হ'লে রুপার্টের মত সুখী আর কে আছে ? আজ সোনা-রূপা, হীরা-জহরত তার হাতের মুঠোয়।

রুপার্ট দেউড়ির মধ্যে ঢুকতে যাবে এমন সময় দ্বারীরা বাধা দিলে। বললে—“কে তুমি বিদেশী ?”

রুপার্ট শুধু বললে—“আমি।”

—“রত্নপুরীতে যেতে চাও বুঝি ?”

—“হাঁ।”

—“কিন্তু মর্ত্ত্যলোকের হৃদয় নিয়ে রত্নলোকে যাওয়া যে নিষিদ্ধ। তোমার হৃৎপিণ্ডের যেটুকু এখনও বাকি আছে সেটুকু দিলে তবে ভেতরে যেতে পাবে। নইলে নয়।”

—“বেশ। তাই যদি তোমাদের নিয়ম তো তাই নাও।”

রত্নপুরীর দৌবারিকরা রুপার্টের বুক থেকে বাকি হৃৎপিণ্ড-টুকু উপড়ে নিলে। নিয়ে তার জায়গায় বসিয়ে দিলে একটি পাথরের গোলা। সে গোলা হীরার মত উজ্জ্বল, আবার হীরার মতই শক্ত। কিন্তু হৃৎপিণ্ড টেনে তোলার সময় সব-টুকুই যে উঠে এসেছিল তা' নয়। সরষেদানার মত অতি ক্ষুদ্র একটি টুক্‌রো বুকে লেগে ছিল, রত্নপুরীর দ্বারীরা তা' লক্ষ্য করেনি।

যাই হোক্ রুপার্ট দেউড়ি পার হ'য়ে ভেতরে গেল। আজ তার স্বপ্ন সফল হ'ল। কিন্তু কই তার মনের সে আনন্দ গেল কোথায় ? সে ইচ্ছে করলে এখন মুঠো মুঠো মণি-মাণিক্য কুড়িয়ে তা' দিয়ে ছিনি-মিনি খেলতে পারে। রুপার্টের

হাতে আজ এত ঐশ্বর্য্য যে, তা' দিয়ে পৃথিবীর সকল রাজ্য কিনে নিতে পারে। কিন্তু রুপার্ট আর সে রুপার্ট নেই।

সে ভাবলে—'হৃদয় গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে আশা আকাঙ্ক্ষা সবই গেল। তবে আর এ ধনরত্নে কাজ কি ?'

তার ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়ল। রত্নপুরীর রাজকন্যা

রত্নরথে চ'ড়ে সোনা-বাঁধান রাস্তায় বেড়াতে বেরিয়েছেন। আট ঘোড়ায় তার রথ টেনে চলেছে। যেমন রথ তেমনি তার বাহন। ঘোড়ার গলায় মুক্তার মালা। গায়ে সোনা-দানার পোষাক ঝল্‌মল্ করছে। সোনার নালে খুর বাঁধান। আট জোড়া মণিহারের লাগাম ধ'রে সারথী ব'সেছে রথের

সামনে। আর রথের ভেতর রত্নাসনে বসে রাজকন্যা। রাজকন্যার মুখটি খুবই সুন্দর, কিন্তু মাটির পুতুলের মতই তা'তে কোন ভাবের আভাস নেই। সে দেশের সকল লোকের মুখই যেন ঐ রকম। তাদের না আছে আশা আনন্দ, না আছে ভাবনা চিন্তা, না আছে দুঃখ বিষাদ।

রুপার্ট রত্নরথের দিকে চেয়ে রইল। ঝন্ ঝন্ শব্দে সোনার পথে সোনার নাল ঠুকে আট ঘোড়া রাজকন্যাকে নিয়ে চ'লে গেল। রুপার্টের মনে হ'ল এক ঝলক বিদ্যুৎ যেন রাজপথ দিয়ে উড়ে গেল।

পথ দিয়ে আপন মনে লোক চলেছে দলে দলে। কেউ তাকায় না কারুর দিকে, কেউ কথা বলে না কারু সঙ্গে। সে দেশে কেউ কারু শত্রু নয়, কেউ কারু বন্ধু নয়। একি অদ্ভুত দেশ!

রুপার্ট বুঝল পাথর দিয়ে যাদের হৃদয় তৈরী তাদের কাছে আর কিছু আশা করা বৃথা। রত্নপুরীর দ্বারীরা রুপার্টের সম্পূর্ণ হৃৎপিণ্ডটি উপড়ে নিলে, সেও তাদের মতই হ'য়ে [illegible]

[illegible]ার রত্নরাশির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ তার এ হ'ল কি? আজ কেন মা-বাবার মুখ বারে বারে মনে পড়ে? ভাইবোনের সঙ্গে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ানোর জন্যে কেন তার

প্রাণ ছটফট্‌ করে ? সুখ-দুঃখের নীড় সেই ছোট্ট কুটীরখানির কথা ভেবে তার বুক আজ ব্যথিয়ে ওঠে কেন ?

'না, না। চাইনে আমি ধনরত্ন। কি হবে আমার ঐশ্বর্য্যে ? স্নেহ-প্রীতি দয়া-মায়া হাসি-খেলা সব হারিয়ে শুধু সোনা-রূপা নিয়ে করব কি ?'—রূপার্টের মন ব্যাকুল হ'য়ে উঠল। সে ঠিক করলে আবার বাড়ী ফিরে যাবে। বাড়ীর কথা ভাবতেই তার হৃদয় আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠল। সত্যিকারের হৃদয় তার কতটুকুই বা ছিল! তবু তারই আনন্দ কি কম। পাথরের গোলা তার বুকে চেপে ব'সে আছে বজ্রের মত। তার চাপে বুক বেদনায় টনটন করছে। সেই বেদনার ভার ভেদ ক'রে হৃদয়ের [illegible] ফুটে উঠল তার মুখে। ঘরে ফেরার আশায় তার শুক[illegible] দীপ্তি এল ফিরে, চোখ দুটি আবার হ'য়ে উঠল উজ্জ্বল।

রূপার্ট যেমন ভাবে রত্নপুরীর পথে যাত্রা ক'রেছিল ঠিক তেমনি ভাবেই সে রত্নপুরী থেকে বেরিয়ে পড়ল। পুরীর বাইরে পা দিয়েই সে প্রথম যে পথটি দেখলে সেই পথ ধ'রেই দিল ছুট। কি আশ্চর্য্য! কোথায় গেল [illegible] পর্ব্বত, সেই গভীর খাদ, সেই খরস্রোতা নদী [illegible] নিষ্কণ্টক পথ—কোথাও বাধা দেবার কেউ নেই।

কতক্ষণ ছুটেছে রূপার্টের ঠিক খেয়াল নেই। যখন সে

দম নেবার জন্যে থামলে তখন দেখতে পেলে সামনে একটা ... গাছটা তো চেনা চেনা ঠেকছে। ও! তবে কি সে ... গ্রামেই এসে পড়ল নাকি! হ্যাঁ হ্যাঁ, ঐতো ঐতো গ্রামের গির্জ্জার চূড়া দেখা যাচ্ছে। বৃদ্ধ সৈনিকের বাড়ীর চিমনী দিয়ে ঐযে ধোঁয়া উঠছে।

বৃদ্ধ সৈনিকের বাড়ীর ঠিক পশ্চিমেই রুপার্টের বাড়ী। পাঁচ মিনিটের পথও নয়। রুপার্টের বুকে সেই ছেঁড়া হৃৎপিণ্ডের টুক্‌রোটা আনন্দে নাচতে লাগল। এতটুকু তো হৃদয়, কিন্তু কি তার কাঁপুনি! তার স্পন্দনে নিশ্চল জমাট পাথরের গোলাটা বুকের পাঁজরে বাজতে লাগল—ঠক্ ঠকাশ্! ... ঠক্ ঠকাশ্!

...র ঠিরের দরজায় এসে পা দিলে। দেখলে আঙিনার কোণে ব'সে ছোট ভাইটি আর বোন্‌টি মিলে খেলাঘর সাজাতে ব্যস্ত। পায়ের শব্দ শুনে তা'রা পিছন ফিরে দেখলে রুপার্ট দাঁড়িয়ে। "দাদা দাদা"—আনন্দে তাদের গলা দিয়ে আর কোন কথা বেরোল না। তারা খেলাঘর ... এক লাফে উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরলে। রুপার্ট ...কে আদর ক'রে তাদের চুমো খেলে।

রুপার্টের বাবা ঘরের ভেতরে ছিলেন। তিনি ছেলেমেয়ের চীৎকার শুনে বেরিয়ে এসেই রুপার্টকে কোলে তুলে নিলেন।

হারান ছেলেকে ফিবে পেয়ে তা'কে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন—"কোথা ছিলিরে এ ক'দিন ? এমনি ক'রে না ব'লে ক'য়ে কোথাও কি যেতে আছেরে, পাগল ছেলে ?"

ভাই-বোনের ভালবাসায় বাবার স্নেহে রুপার্টের সেই ছেঁড়া একটুখানি হৃদয় উদ্বেলিত হ'য়ে উঠল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোল না। পাষাণের গোলাটা যেন তার কণ্ঠ চেপে রইল। হায় হায়, একি হ'ল তার! এই পাষাণহৃদয় গলিয়ে দিতে পারে এমন কেউ কি নেই জগতে ?

"রুপার্ট ! রুপার্ট !—আমার রুপার্ট কি ফিরে এলিরে !"—ব'লে মা ব্যাকুল ভাবে ছুটে এলেন। এসে ব্যগ্রভাবে তা'কে কোলে তুলে নিয়ে তার চুমো খেয়ে বললেন—"বাবা, এসেছিস্ তুই ?"

জগদ্দল পাথরের চাপে সমস্ত বুকটাই কি তার পাষাণ হ'য়ে গেল নাকি ? সে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে যদি চোখের জলে তাঁর বুক ভাসিয়ে দিতে পারে, তবে যেন নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু চোখের জলের পথও যে বন্ধ।

মায়ের অশ্রু প্রভাতের শিশিরের মত অবিরলধারে ঝরে পড়ল রুপাটের মাথায়। বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত পবিত্র সেই অশ্রুধারা গড়িয়ে এসে পড়ল তার বুকের উপর।

সেই অণুপরিমাণ হৃদয়খণ্ডটুকু নেচে উঠল উন্মাদের মত। পাথরের গোলা তার আঘাতে ছিটকে বেরিয়ে এসে শূন্যে গেল মিলিয়ে।

মায়ের অশ্রুর স্পর্শ পেয়ে খণ্ডহৃদয়টুকু আবার অখণ্ড হ'য়ে

উঠল। রুপার্ট একবার শুধু চমকে উঠে বললে—"মাগো, বাঁচলাম।"

এই ব'লে আবার সে মায়ের বুকে মুখ লুকাল। এবার তার উচ্ছ্বসিত চোখের জল অজস্রধারায় ঝরতে লাগল বাঁধভাঙা বন্যার মত।

এর পর রুপার্টকে রত্নপুরীর খবর জিজ্ঞেস ক'রেছে অনেকে। তার মুখে এক উত্তর,—

"ধনরত্ন যদি দেওয়ার হয় তো ভগবান দেবেন। ফাঁকি দিয়ে বড়লোক হওয়ার চেষ্টা ক'রো না, তা'তে নিজেই ফাঁকি পড়বে। কাবণ হৃদয়টাব মূল্য হীরা-জহরতের চেয়ে কম নয়।"

"দেখ তো খাদিমা, মালাটা হ'ল কেমন?'

তাঁর রাজ্যের দিকে রওনা হ'য়েছেন। চরের মুখে কয়েকদিন আগেই এই খবর এসে পৌঁচেছে। এখন উপায়!

টাকা চাই, টাকা! সৈন্যদের খেতে দিতে হবে—খুশী করতে হবে তাদের। তা'রা যুদ্ধ করবে তবে তো বাঁচবে দেশ। কিন্তু টাকা কোথা? কে দেবে টাকা? সমস্ত রাজকোষ হীরা-জহরত হ'য়ে বেগমের অঙ্গে পেয়েছে স্থান। সুলতানের সাধ্য কি যে তা'তে হাত দেন? তিনি কত কাকুতি-মিনতি ক'রেছেন, কত সাধ্য-সাধনা ক'রে দেখেছেন, কিছুতেই কিছু হয় নি। তাঁর মুখে সেই এক জবাব—"তোমার রাজ্য তুমি জান। আমি তার কি জানি? গয়না আমার—এ আমি দেব না। তা'তে যা-ই হয় হোক।"

পুরানো বেগমের কথা স্মরণ ক'রে আজ রাজার চোখ সজল হ'য়ে উঠল। রাজা বড় ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন।

এদিকে শত্রু-সৈন্য এসে পড়ল। তিনদিনের পথ পার হ'লেই তা'রা রাজ্যের সীমানায় পা দেবে। অথচ বাধা দেবার তো কোন উপায়ই নেই। হায়, যদি আজ পুরানো উজির থাকতেন তা' হ'লে হয় তো বা একটা কোন বুদ্ধি তিনি বের করতে পারতেন। যেদিন তাঁ'কে বিদায় দেওয়া হ'য়েছে সেদিন থেকেই তিনি ঘর-সংসার ছেড়ে কোথায় যে চ'লে গেছেন কেউ জানে না।

মুশকিল আসান

মুশকিল আসান

—১—

সুলতান সুলেমানের রাজত্বে তুর্কী দেশের লোকজন খুব সুখেই ছিল। দেশে ধন-রত্নের অভাব ছিল না। বছরে বছরে ফসলও হ'ত প্রচুর। তা' ছাড়া খেজুর, পেস্তা, বাদাম, আখরোট, আঙ্গুর, মোনাক্কা প্রভৃতি এত জন্মাত যে, দেশের লোক পেট ভ'রে খেয়েও ফুরোতে পারত না। এই সব মেওয়া তখন উটের পিঠে বোঝাই দিয়ে স্থলপথে—আবার কখনও পালতোলা জাহাজে ক'রে সমুদ্রপথে দেশ-বিদেশে চালান যেত।

সুলতান নিজে ছিলেন খুব ধার্ম্মিক। ভগবানের নাম না নিয়ে তিনি জলগ্রহণ করতেন না। প্রজারাও তাঁর দেখাদেখি ঈশ্বরকে ভক্তি করত। তুরস্কে তখন চুরি-ডাকাতি দেখাই যেত না। মিথ্যা কথাও কেউ বলত না। যদি বা কেউ ভুল ক'রে একটা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলত, সুলতান তা'কে কঠিন শাস্তি দিতেন। দণ্ডের ভয়ে দুষ্ট লোকেও দুষ্টামি করতে সাহস পেত না।

এত সুখ এত শান্তি কিন্তু চিরকাল রইল না। সুলতানের প্রধান বেগম হঠাৎ মারা গেলেন। তিনি ছিলেন প্রজাদের মায়ের মত। দীন-দুঃখী তাঁর কাছে এসে হাত পাতলে কখনও বিমুখ হ'য়ে ফিরত না। সেই পুণ্যবতী বেগমের মৃত্যুতে মনে হ'ল রাজলক্ষ্মী যেন রাজ্য ছেড়ে চ'লে গেলেন। প্রজারা সকলে হাহাকার ক'রে কাঁদতে লাগল। হায়! এমন বেগম কি তা'রা আর পাবে?

সুলতান বেগমকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন, তাঁর মৃত্যুতে তিনি এতই ব্যাকুল হ'য়ে পড়লেন যে, রাজকার্য্য পর্য্যন্ত নিয়মিত দেখতে পারতেন না। উজির দেখলেন, এ-তো ভারী বিপদ! সুলতান যদি সারাক্ষণ এমনি বিমর্ষ হ'য়ে ব'সে থাকেন, তা' হ'লে তো রাজ্য হবে অচল। দেশে থাকবে না শৃঙ্খলা। শেষে যে অরাজক হবে দেশটা!

উজির সকল কর্ম্মচারীকে ডেকে তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলেন, যেমন ক'রেই হোক একটি ভাল মেয়ে দেখে শুনে সুলতানের বিয়ে দিতে হবে আবার। প্রধান বেগমের কোন ছেলে-মেয়ে হয় নি। সুলতান যদি বিয়ে না করেন তো তাঁর পরে এ সিংহাসনে বসবার যে আর লোক থাকবে না।

সুলতান তো প্রথমে কিছুতেই রাজী হন না। শেষে

রাজ্যের সকল প্রজা এসে বায়না ধরলে—বিয়ে করতেই হবে। না হ'লে তা'রা ছাড়বে না কিছুতেই। কি আর করেন, অগত্যা সুলতানকে মত দিতে হ'ল।

—২—

মত পেয়ে উজির বেরোলেন মেয়ের খোঁজে। কিছুদিনের মধ্যে একটি সুন্দরী মেয়ের সন্ধানও পাওয়া গেল। মেয়েটি হচ্ছেন বোগদাদের বাদশার মেয়ে। উজির এবং কর্ম্মচারীদের চেষ্টায় তাঁরই সঙ্গে সুলতানের বিয়ে হ'য়ে গেল।

বিয়ে তো হ'ল, কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। বাদশাজাদি এসেই বললেন—"রাজ্যের একি ব্যবস্থা ! প্রজারা সব দু'হাত দিয়ে লুটে খাচ্ছে যে ? এত দান-খয়রাত কেন ?"

নূতন বেগমের রূপে সুলতান মুগ্ধ। তাঁর কথা রাখতে, তাঁকে খুসী করতে সুলতানের চেষ্টার অন্ত নেই। নূতন বেগমের কথায় পুরাতন অনেক কর্ম্মচারীকেই বিদায় দিতে হ'য়েছে। বুড়ো উজিরের পর্য্যন্ত চাকরী গেল। তিনি বেগমের কথার উত্তরে জবাব দিয়েছিলেন—"আহা, ওরা গরীব ; রাজকোষ থেকে তাই ওদের কিছু কিছু দেওয়া হয়। দীন-দরিদ্র প্রজারা যদি ভাণ্ডার থেকে কিছু না পায় তা' হ'লে বাঁচবে কি ক'রে ?"

"না বাঁচে তো না বাঁচল তা'তে আমার কি!"—ব'লে বেগম রাগে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বললেন—"কেন? রাজপুরীটা কি সরাইখানা নাকি যে, যে আসবে সে-ই পাত পাতবে? ওসব চলবে না।" এই ব'লে তিনি বুড়ো মন্ত্রীকেও তাড়িয়ে দিলেন।

এমনি ক'রে দু'বছর কাটল। সে রাজ্যের পূর্ব্বের অবস্থা আর নেই। রাজা আর প্রজাদের ভাল-মন্দর খবর নেন না। কর্ম্মচারী যা'রা নতুন এসেছে তা'রা নিজেদের লাভের জন্যে ব্যস্ত। তাদের অত্যাচারে প্রজারা মরতে ব'সেছে। তা'রা খেতে পা'ক আর না পা'ক—রাজকর্ম্মচারীরা খাজনা আদায় না ক'রে আর ছাড়ে না। তাদের দুঃখের কথা আজ আর শুনবে কে? তাদের কান্নার শব্দ তো আর রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ভেদ ক'রে ভিতরে পৌঁছয় না।

এদিকে দেশের অবস্থা যতই খারাপ হ'তে লাগল, বেগমের ঐশ্বর্য্য ততই বাড়তে লাগল। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রজারা যা' উপায় করে, রাজার লোকজন গিয়ে তা' জোর ক'রে কেড়ে আনে। বেগম তাই দিয়ে কেনেন হীরা, মুক্তা, মণি-মাণিক্য, চুণি-পান্না।

নিরন্ন প্রজার কুটীরে এক টুক্‌রো রুটির জন্যে যখন কান্না-কাটি পড়েছে, বেগম সাহেবা তখন মাথার ওড়নাটা মুখের

"—ওসব চলবে না।"

উপর থেকে উঠিয়ে গলার মুক্তা-মালাটা তু'লে ধ'রে সখীর দিকে চেয়ে বলেন—"দেখ্ তো খাদিমা, মালাটা হ'ল কেমন? সাত সাগরের সাতশ' মুক্তা এনেছিল সপ্তদ্বীপের সাত জহুরী। তারই মধ্যে বাছাই ক'রে নিলেম একশ' আটটি। তাই দিয়ে গড়েছি এই মালা।"

খাদিমা বললে—"আজ ওদের মুক্তা-জন্ম সার্থক হ'ল শাহজাদি। আপনার গলা সুন্দর ব'লেই ওদের এত মানিয়েছে; সবার গলায় কি আর এমন সুন্দর দেখাত?"

বেগম মনে মনে খুশীই হ'লেন। একটু মুচ্‌কি হেসে বললেন—"যাঃ, কি যে তুই বলিস্ খাদিমা?"

—৩—

রাজকোষ এখন একেবারে শূন্য। রাজকার্য্য চালানোই অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। দেশের লোকজন অধিকাংশই চ'লে গেছে বিদেশে, কেউ নিয়েছে অন্য রাজার আশ্রয়। সৈন্যদের মধ্যে দেখা দিয়েছে অসন্তোষ। তা'রা জানিয়ে দিয়েছে মাইনে না পেলে তা'রাও কাজ ছেড়ে দেবে। পেটে খাবার না পড়লে লড়াই করবে কেমন ক'রে!

সুলতান দেখলেন ভারি বিপদ! অথচ মিশরের সুলতান

—৪—

আকাশে সন্ধ্যার অন্ধকার এল ঘনিয়ে। রাজ্যের দোকান-পাট বন্ধ। রাজবাড়ীর তোরণদ্বারও বন্ধ হ'য়ে গেছে —এমন সময় দেউড়ির বাইরে গম্ভীর গলায় শোনা গেল—

"মুশকিল আসান!"

"মুশকিল আসান!" কথাটা সুলতানের কানেও গেল। তিনি তখন রংমহলের সপ্ততল কক্ষে ব'সে খোলা জানালার দিকে চেয়ে উদাস মনে আসন্ন বিপদের কথা ভাবছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে গেল—

"মুশকিল আসান!"

সুলতান উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন, দেউড়ির সামনে দাঁড়িয়ে এক ফকির। ফকিরের হাতের ম্লান দীপ-শিখাতে তার মুখের একরাশ সাদা দাড়ি ছাড়া আর কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। সুলতান ভাবতে লাগলেন—'হায়! ভগবান তো সকলের মুশকিলই আসান করেন। আমার এবিপদ থেকে কি তিনি উদ্ধার করবেন না?' কিন্তু তাঁর চিন্তায় বাধা পড়ল। ফকিরের ডাক আবার শোনা গেল—

"মুশকিল আসান!"

সুলতানের কি মনে হ'ল হঠাৎ—তিনি কাউকে কিছু না

ব'লে নেমে গেলেন একলাই। নিজের হাতে খুললেন দেউড়ির প্রকাণ্ড দ্বার। তারপর ভাল ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলেন ফকিরের মুখ তাবই প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে। ফকির বললেন—"কি দেখছেন জঁাহাপনা?"

সুলতান বললেন—"আমার চোখ ভুল করে নি উজির সাহেব! কানে যখন ডাক পৌঁছল তখনি কেমন সন্দেহ হ'য়েছিল। এখন মুখ দেখে আর বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু উজির সাহেব, আমার অপরাধের কি প্রায়শ্চিত্ত নেই? আপনার মত সাধুপুরুষকে আমি বিনা কারণে বিদায় করেছি। বেগমের কথায়…"

সুলতানের কথা শেষ করতে না দিয়েই ফকির ব'লে উঠলেন—"সে সব কথার এখন অবসর নেই জঁাহাপনা! শত্রুসৈন্য এল ব'লে। আগে রাজ্য রক্ষা করুন। তারপর সব শুনব। সংসার ছেড়ে ফকির হ'য়েও এ বিপদের কথা জেনে স্থির থাকতে পারলাম না। তুর্কীরাজ্য যাবে বিদেশীর হাতে? সে কখনও হবে না।"

—"কিন্তু উপায় তো আর কিছুই নেই। আমি নিজে নিঃস্ব। আমার না আছে সৈন্য-সামন্ত, না আছে অর্থ-সম্পদ, না আছে একজন বিশ্বাসী কর্ম্মচারী। কেমন ক'রে বাঁচাব দেশকে? আমি আপনাদের অপমান ক'রে তাড়িয়েছি।

নিজের কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছি, কত গুণী ব্যক্তির অসম্মান করেছি, তার শাস্তি আমাকে আল্লা দেবেন। শত্রুর হাতে আমার পরাজয় নিশ্চিত।"

"কিছুতেই না!" ফকির দৃপ্তস্বরে আবার বললেন—"আমি থাকতে সে কিছুতেই হবে না—উপায় এখনও আছে, আমার কথামত যদি চলেন তো সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তবে আপনাকে একটু শক্ত হ'তে হবে। পারবেন ?"

—"নিশ্চয় পারব। এবার আমার জ্ঞান হয়েছে। বলুন কি করতে হবে ?"

ফকির বললেন—"এতদিন সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থে ঘুরে এক আশ্চর্য্য জিনিষ পেয়েছি। এই দেখুন"—ব'লে ফকিরসাহেব তাঁর আলখাল্লার ভেতর থেকে একটি আংটি বের ক'রে সুলতানের হাতে দিলেন।

সুলতান আংটিটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—"এতে কি হয় ?"

"এই আংটি পরে যার মত হতে চাইবেন, আপনার চেহারা তারই মত হবে। আপনি এই আংটি পরে বলুন—আমার চেহারা হোক মিশরের সুলতানের মত।"

সুলতান আংটি আঙ্গুলে প'রে তাই বললেন। অমনি এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁর চেহারা গেল বদলে। ফকির তখন

তাঁর আলখাল্লার ভেতর থেকে বের করলেন একটি ছোট আয়না। আয়নাটি বের ক'রে দিলেন সুলতানের হাতে। আয়নার দিকে চেয়ে সুলতান দেখলেন কি আশ্চর্য্য! এতো আর তাঁর মুখের চেহারা নয়! এ যে মিশরের সুলতান! তাঁর শত্রু!

ফকির বললেন—"শাহাজাদা, এখন মিশরের সুলতানের চেহারার কি পরিবর্ত্তন হয়েছে জানেন কি? তিনি হয়েছেন এখন তুরস্কের সুলতান।"

—"আমার চেহারা?"

—"হাঁ, আপনার চেহারা নিয়েই নদীর ওপারে শিবিরের মধ্যে তিনি এখন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছেন। কাল সকালেই নদী পেরিয়ে আপনার রাজ্য আক্রমণ কববেন—এই তাঁর মতলব।"

"এখন আমি তা' হ'লে কি করব?"—রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

"অবিলম্বে নদী পেরিয়ে যান চ'লে ওপারে। নৌকো প্রস্তুত আছে ঘাটে। গিয়েই হুকুম দেবেন সৈন্যদের—তুরস্কের সুলতানকে বন্দী করতে। বলবেন, শিবিরের মধ্যেই গোপনে তিনি প্রবেশ করেছেন। এইভাবে মিশরের সুলতানকে বন্দী ক'রে তাঁরই সৈন্য নিয়ে নিজের রাজ্য অধিকার করুন

নূতন ক'রে। যান, আর বিলম্ব করবেন না।”—এই ব'লে ফকির সেখান থেকে চলে গেলেন।

—৫—

সকালে উঠে তুরস্কের লোকজন শুনতে পেল, সুলতান কাল রাত্রে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। ওদিকে শত্রুরাও জয়ধ্বনি করতে করতে নগর-দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়েছে। এই দেখে তুর্কীসৈন্য আর তুরস্কের অধিবাসীরা যে যে দিকে পারল ছুটল প্রাণের ভয়ে। কিন্তু হায়, যাবে কোথা ? তাদের বেরোবার আগেই শত্রুরা ঘিরে ফেললে সমস্ত দেশ। পালানর উপায় রইল না। কিন্তু একটা জিনিষ দেখে সকলেরই মনে আশ্চর্য্য লাগল, শত্রুসৈন্যেরা তো কোন অত্যাচার করছে না কারুর উপরে। শুধু যা'রা দেশ ছেড়ে পালাতে চেয়েছে তাদের ফিরিয়ে দিচ্ছে, বাইরে বেরোতে দিচ্ছে না। এতে তা'রা আরও বেশী ভয় পেল, কি জানি তাদের মনে কি আছে ?

কয়েক দিনের মধ্যেই নতুন সুলতান অধিকার ক'রে বসলেন তুর্কীদেশ। প্রজারা দেখল তিনি ভাল ব্যবহারই করছেন। ক্রমে ক্রমে তাদের ভয় ভেঙ্গে গেল। মিশরের সৈন্য যা'রা এসেছিল, তা'রাও সবাই রয়ে গেল তুর্কী দেশে। সুলতানের এইরকম পরিবর্ত্তনে তা'রাও কম আশ্চর্য্য হয়নি।

এমনি ভাবে কিছুদিন কাটল। সুলতান বন্দী হ'য়ে রয়েছেন কারাগারে। অন্য বন্দীশালায় বেগমকেও রাখা হয়েছে কড়া নজরে। আজ তাঁদের বিচার হবে। সভায় তাই অনেক লোকের ভিড়।

একদিক থেকে প্রহরীরা সুলতানকে ধ'রে আনল। পুরাতন সুলতানকে এই অবস্থায় দেখে সভার সকল লোকেরই চোখে জল গড়াল। কিন্তু ভরসা ক'রে কেউ কিছু বলতে পারলে না।

ওদিকে মেয়ে প্রহরীরা নিয়ে এল বেগমকে। তাঁর অঙ্গে আর সে লাবণ্য নেই। মুখের সে দীপ্তি আজ মলিন। অলঙ্কারের বদলে শক্ত লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা দুটি হাত। চোখের কোণে কান্নার চিহ্ন তখনও শুকোয়নি।

মিশরের সুলতান হুকুম দিলেন—"বন্দীর প্রাণদণ্ড।"

বন্দীর প্রাণদণ্ড! বেগমের বুকটা উঠল কেঁপে। নিজের দোষে রাজ্যের সর্ব্বনাশ করেছেন। প্রজাদের সর্ব্বনাশ করেছেন। আজ স্বামীর প্রাণ যাবে শত্রুর হাতে—সেও তো তাঁরই জন্যে।

তিনি কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সুলতানকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"শাহানশাহ! বন্দিনীর একটি নিবেদন আছে।"

মুশকিল আসান

"শাহানশাহ! বন্দিনীর একটি নিবেদন আছে।"

—"বেশ, বল।"

—"বন্দিনীর প্রাণ নিয়ে এই বন্দীকে মুক্তি দিন্।"

—"তা' তো হয় না রমণী।"

—"আপনার হাতে আজ যখন বন্দী হয়েছি, তখন আপনার যা' মর্জ্জি হবে তাই আমাদের মানতে হবে। কিন্তু আমি বলছি আপনারই ভালর জন্যে। বন্দীকে হত্যা করলে আপনার কোন লাভ নেই, কিন্তু তাঁকে মুক্তি দিলে আপনি প্রচুর ধনরত্ন পাবেন।"

"কেমন ক'রে?"—মিশরের সুলতান উৎসুক হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—"শাহানশাহ! তুরস্কের রাজধানীটাই শুধু আপনি অধিকার করেছেন, কিন্তু তার রাজকোষে কিছু পেয়েছেন কি?"

—"না, রাজকোষ তো দেখলাম শূন্য।"

—"সে রাজকোষের সমস্ত অর্থ আমার কাছে। রাজ্যের ঐশ্বর্য্য উজাড় ক'রে দিয়ে সংগ্রহ করেছিলাম হীরা, মুক্তা, রত্নরাজি। সে সব এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি যে কা'রও সাধ্য নেই খুঁজে বের করে। আপনি যদি আমার স্বামীকে মুক্তি দেন তো সে সব আপনারই হবে।"

—"বন্দিনী, তোমার কথায় আমি খুশী হলাম। সে জন্যে তোমাকেই মুক্তি দিলাম। তোমার সাধের সঞ্চয় হীরা, মণি,

মাণিক্যে আমার কোন প্রয়োজন নেই। ওগুলি তুমিই পাবে। কিন্তু তোমার স্বামীর মৃত্যুদণ্ড কিছুতেই রদ হবে না।"

—"স্বামীর প্রাণ দিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করব? সুলতান সাহেব, আপনি যদি নারী হতেন তা' হ'লে একথা বলতেন না। একদিন ধনরত্নই চিনেছিলুম, স্বামী চিনি নি। আজ তাঁ'কে হারাতে ব'সে বুঝেছি··" বেগমের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরোল না। তাঁর চোখে বইল অশ্রুর বন্যা।

বন্দিনীর কথায় রাজ্যের সকল লোকই বিচলিত হ'য়ে উঠল। মিশরের সুলতান বললেন—"তোমার পতিভক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়েছি রমণী। তুমি এবং তোমার স্বামী উভয়েই মুক্ত।"

এই ব'লেই তিনি ফকিরের দেওয়া সেই আংটিটি আঙ্গুল থেকে খুলে ফেললেন। অমনি এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল। দেখা গেল, এক নিমেষের মধ্যে বন্দী তুরস্কের সুলতান এসে বসেছেন তাঁর পুরানো সিংহাসনে, আর প্রহরী পরিবেষ্টিত হাতকড়া আঁটা মিশরের সুলতান রয়েছেন দাঁড়িয়ে তুরস্কের সুলতানের জায়গায়।

এমন সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে উঠে উচ্চ-কণ্ঠে ডাক দিলেন—

"মুশকিল আসান।"

ডাক শুনে সবাই ফিরে তাকাল সেই দিকে। দেখলে এক সৌম্য-দর্শন বৃদ্ধ। তিনি ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রাজার কাছে। সবাই সসম্ভ্রমে তাঁ'কে পথ ছেড়ে দিলে। সুলতান সিংহাসন থেকে নেমে এসে তাঁ'কে অভিবাদন করলেন। বললেন—"আপনার ঋণ জীবনে ভুলতে পারব না।"

—"তা' নয় হুজুর। আমি আপনার পিতার নিমক অনেক খেয়েছি। তারই যৎকিঞ্চিৎ শোধ করলাম।"

তারপর তিনি বন্দিনীর দিকে চেয়ে বললেন—"বাদশাজাদী, আপনার এই বুড়ো-ছেলেকে ক্ষমা করুন। যিনি রাজ্যের রাণী তাঁকে কি বন্দিনী বেশে শোভা পায়? যান সুলতান সাহেব, মা আমার অনেক দুঃখ পেয়েছেন। তাঁ'কে আপনি নিজের হাতে তুলে এনে সিংহাসনে বসান।"

এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটা কাণ্ড হ'ল যে, দেখে সকলেই হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা কি কেউ ঠাওর করতে পারেনি। মিশরের সুলতান তো এতদিন কেবলই ভাবছেন—তিনি ভূতের রাজ্যে এসে পড়েছেন। তা' নইলে তাঁকে সবাই তুর্কী সুলতান বলবে কেন? আবার ঠিক তাঁরই মত কে একজন এসে তাঁরই সৈন্য-সামন্ত দিয়ে তাঁকে বন্দী করলে—এটাই বা সম্ভব হয় কি ক'রে? আবার এক মুহূর্ত্তের

মধ্যে সেই লোকটারই বা মূর্ত্তি বদলে গেল কোন্ মন্ত্রের বলে ? মিশরের স্থলতানের কাছে কারাগারের দুঃখ, দুঃখ ব'লেই মনে হয়নি। যাদুকরের ভেল্কি বাজি দেখতে দেখতে ভয়ে বিস্ময়ে তিনি সব ভুলেই গিয়েছিলেন।

বেগমের হাত তখনও শৃঙ্খলে বাঁধা। স্থলতান উজিরের কথায় নিজেই গেলেন তাঁর বাঁধন খুলে দিতে। কিন্তু বেগম তাঁকে তাঁর শৃঙ্খল পর্য্যন্ত স্পর্শ করতে দিলেন না। বললেন —"কে তুমি সেই পরিচয় আগে দাও। তারপরে স্পর্শ ক'রো আমাকে।"

"আপন স্বামীকে চিনতে পারছো না শাহাজাদী ?"—ব'লে স্থলতান একটু হাসলেন।

"মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে চেহারা বদলায় তা'কে বিশ্বাস করি কি ক'রে ? এইত কিছুক্ষণ আগে আমার পাশের এই বন্দী পুরুষকেই আমার স্বামী ভেবেছিলাম। তখন তার মূর্ত্তি ছিল তোমার মত। আর তখন তুমি এরই রূপ ধ'রে ব'সে ছিলে সিংহাসনে।"—বেগম কঠিন স্বরে বললেন।

"গণ্ডগোলের আমি মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি।"—ব'লে উজির তখন এগিয়ে এলেন। তারপর তিনি সকলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ব্যাপার যা' যা' ঘটেছিল সব কথা খুলে বললেন—একেবারে গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত।

সব শুনে দেশের লোক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। বেগমকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে সুলতান বিদেশী বন্দীর বাঁধন নিজের হাতে খুলে দিয়ে তাঁকে বললেন—"বন্ধু, তুমি মুক্ত। তোমারই দয়ায় আজ রাজ্য ও রাণী দু-ই ফিরে পেলাম।"

তারপর সুলতান উজিরকে ডাকলেন—"উজীর সাহেব।"

কিন্তু কোথায় উজীর সাহেব? ভিড়ের মধ্যে তাঁর আর খোঁজ পাওয়া গেল না। সবারই মুখে এক কথা। "উজির সাহেব, উজির সাহেব, কোথা গেলেন উজির সাহেব?"

উজির সাহেব একজনের মুশকিল আসান ক'রে এতক্ষণে হয়তো আবার কোন বিপন্নের দ্বারে গিয়ে ডাক দিচ্ছেন;—

মুশকিল আসান।

পৃথিবীর জন্ম

পৃথিবীর জন্ম

(ইবাণ দেশেব পুবাণ-কথা)

মনে কব তুমি এমন জায়গায় গিয়ে পড়েছ যেখানে কোথাও কিছু নেই। না আছে জলস্থল, না আছে পশুপাখী, না আছে গাছপালা। যেদিকেই তাকাও না কেন কিছুই তোমার চোখে পড়ছে না। শুধু অন্ধকার—জমাট কালো অন্ধকার—কোথাও যার শেষ নেই। চারদিক নীরব, নিস্তব্ধ, নির্জ্জন। তোমরা বলবে—তাও কি হয় ?

বিশ্বাস হয়তো করবে না। কিন্তু পৃথিবীর জন্মেব আগে এমনি অবস্থাই ছিল। ইরাণ দেশের পুরাণে আছে—সেই অন্ধকারময় শূন্যের মধ্যে প্রথম যিনি জন্ম নিলেন তাঁব নাম জর্বন—আমাদের ভাষায় তার অর্থ মহাকাল। তারপর জন্মালেন তাঁর স্ত্রী! জর্বন আর স্ত্রীর জন্ম হ'য়েছিল বিধাতার ইচ্ছায়।

বিধাতা জর্বনকে সৃষ্টি ক'রেই তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন যাগ-যজ্ঞ করতে। যজ্ঞ পূর্ণ হ'লেই তাঁরা একটি ছেলে পাবেন। তাঁর নাম হবে অরমিস্ত। তাঁর হাতেই থাকবে সমস্ত জগতের

ভার। স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গ্রহনক্ষত্র, আলো-বাতাস, জলস্থল, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষলতা এসবই সৃষ্টি কববেন সেই অবমিস্ত।
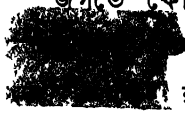
জর্বন বিধাতার আদেশে যজ্ঞ করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে হাজার বছর কেটে গেল তবু যজ্ঞের শেষ হয় না। বিধাতার দয়া না হ'লে শেষ করেন কেমন ক'রে ?

তিনি ভাবেন—'হায়, তবে কি কোন অপরাধ হ'ল? যজ্ঞের কি কোন অঙ্গহানি ঘটেছে? তা' না হ'লে বিধাতার দয়া হ'ল না কেন? জীবনের আর ক'দিনই বা বাকী। কিন্তু তিনি যে বলেছিলেন, একদিন আমাদের যজ্ঞ পূর্ণ হবে এবং আমরা একটি ছেলে পাব? তাঁর কথা তবে কি মিথ্যা হ'ল?'

যজ্ঞের ফল আর বিধাতার বাক্য কোনটাই মিথ্যা হবার নয়। একদিন যজ্ঞের ফল ফলল। জর্বনের স্ত্রীর দুটি ছেলে এল। একটির নাম অরমিস্ত আর একটির নাম অর্হমেন।

জগতে কোন কিছুই নিষ্ফল হয় না। ভাল কাজ করলে [illegible] পাওয়া যায়, মন্দ কাজের জন্যও তেমনি মন্দ [illegible] হবে। কথায় বলে 'অসৎ কর্ম্মের বিপরীত ফল',—কথাটা খাঁটি সত্যি। জর্বনেরও হ'ল তাই। তাঁর স্ত্রীর পেটের মধ্যে যে দুটি ছেলে ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল তার একটি হ'ল যজ্ঞের ফল। সাধুপুরুষের সব লক্ষণ [illegible] তার মধ্যে প্রকাশ পেতে লাগল। এইটি হচ্ছেন [illegible]

আর জর্বনের মনে যে, ভগবানের কথায় অবিশ্বাস এসেছিল সেই অবিশ্বাসের ফলে তাঁর স্ত্রীর পেটে যে আর একটি ছেলে এল, তার সর্ব্বাঙ্গে ফুটে উঠতে লাগল নানা রকমের দুর্লক্ষণ—যা' শুধু দুষ্টলোকের মধ্যেই দেখা যায়। একদিন জর্বনের স্ত্রী

স্বামীকে ডেকে বললেন—"আমার পেটের মধ্যে যমজ সন্তান এসেছে !"

জর্বন স্ত্রীর কথা শুনে বিপদে পড়লেন। দু'জনের মধ্যে কার উপর তিনি সমস্ত জগতের ভার দেবেন ? শেষে কি দু'ভায়ে ঝগড়া মারামারি ক'রে সৃষ্টির আগেই প্রলয় বাধাবে ? না তা' কখনও হ'তে দেওয়া হবে না।

জর্বন মনস্থির ক'রে বললেন—"দুই ছেলের মধ্যে যে আগে মায়ের পেট থেকে বেরোবে সেই হবে সমস্ত বিশ্বের মালিক।"

অরমিস্ত মায়ের গর্ভ থেকেই বাবার মনের কথা বুঝে অর্হমেনকে বললে। অর্হমেনের মনটা তখন থেকেই হিংসায় ভরে উঠল। সে অরমিস্তের কথা চুপটি ক'রে শুনে গেল—কোন জবাব দিলে না।

তারপর যে ব্যাপার হ'ল সে একেবারে ভয়ানক কাণ্ড ! অরমিস্তেরই মায়ের পেট থেকে আগে বেরোবার কথা, কিন্তু আগের দিন অরমিস্ত যখন ঘুমিয়ে আছে তখন অর্হমেন করলে কি, না—মায়ের পেট চিরে চুপি চুপি বেরিয়ে এল। এসেই সোজাসুজি একেবারে জর্বনের সামনে গিয়ে হাজির ! জর্বন তা'কে দেখে চিনতে পারলেন না। বললেন—"কে তুমি ?"

—"আপনার পুত্র"—অর্হমেন গম্ভীর গলায় জবাব দিলে।

—"আমার পুত্র ! আমার পুত্রের চেহারা তো এরকম নয়।

স্বয়ং বিধাতা পুরুষ বলেছেন আমার পুত্র জন্মালে তার মুখের জ্যোতিতে চারদিক হ'য়ে উঠবে উজ্জ্বল। তার অঙ্গের সুগন্ধে সুরভিত হ'য়ে উঠবে দিগ্‌দিগন্ত।"

"আজ্ঞে হাঁ, আমি আপনারই পুত্র।"—কঠিন স্বরে অর্হমেন আবার বললে।

—"কই, তোমার মুখে ত সেই স্বর্গীয় দীপ্তি নেই? তোমার কুৎসিত অঙ্গ সৌরভ-হীন! তুমি যে আমার পুত্র তা' কেমন ক'রে বিশ্বাস করব?"

"বিশ্বাস করুন পিতা ও আপনারই পুত্র" এই কথা বলতে বলতে একটি সুন্দর সুদর্শন ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখেব জ্যোতিতে এতদিনকার জমাট অন্ধকার মুহূর্ত্তের মধ্যে দূর হ'য়ে গেল। এই ছেলেটির সুশ্রী চেহারা দেখে মন তৃপ্ত হ'ল। তার অঙ্গ থেকে ছড়িয়ে পড়ছিল এক অপূর্ব্ব সৌরভ। জর্বন তার দিকে চেয়ে অবাক্ হ'য়ে রইলেন। আনন্দে বিস্ময়ে তিনি এমনি অভিভূত হ'য়ে পড়লেন যে, কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটল না।

আনন্দের ঘোর কাটলে জর্বন অরমিস্তকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তার ললাটে চুম্বন করলেন। তারপর একটি যজ্ঞদণ্ড অরমিস্তের হাতে তুলে দিয়ে জর্বন তা'কে নানারকম সৎ উপদেশ দিয়ে বললেন—"এই যজ্ঞদণ্ডটি বহু যত্নে হাজার বছর ধ'রে রক্ষা ক'রে

এসেছি। এইটির সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের ভার তোমার হাতে তুলে

দিলাম। নূতন পৃথিবী তুমি সৃষ্টি করবে। নবজগতের সেই

ভাবী সাম্রাজ্যের তুমিই হবে সম্রাট্। ধর্ম্মপথে থেকে নিয়মিত যজ্ঞ অনুষ্ঠান ক'রে বিধাতার উদ্দেশ্য সার্থক কর—এই আমার আশীর্ব্বাদ।"

অর্হমেন তখন অগ্রসর হ'য়ে বললে—"কিন্তু পিতা, আপনার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যাচ্ছেন। দুই ছেলের মধ্যে যে প্রথম ভূমিষ্ঠ হবে তারই হাতে আপনি ভবিষ্যৎ পৃথিবীর রাজ্য দেবেন বলেছিলেন। সে কথা নিশ্চয়ই আপনার স্মরণ আছে ?"

জর্বন একথা শুনে কাতর হ'য়ে বললেন—"হায়! কি কুক্ষণেই এমন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।" দুঃখে ও অনুতাপে তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

অরমিস্ত তখন পিতাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—"পিতা, প্রতিজ্ঞা যখন করেছেন তখন অনুতাপ ক'রে লাভ নেই। রাজ্যের ভার আপনি অর্হমেনকেই দিন।"

অরমিস্তের কথায় জর্বন প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অর্হমেনের হাতেই রাজ্য অর্পণ ক'রে বললেন—"দিলাম তোমাকে সাম্রাজ্য। তুমিই হ'লে নূতন জগতের রাজা, কিন্তু তোমার উপরে রাজা রইল অরমিস্ত। তোমার ন্যায় অন্যায়ের বিচার করবে সে। আর এও মনে রেখ যে, তোমার হাতে বিশ্বের ভার থাকবে মাত্র ন' হাজার বছরের জন্যে। তারপর অরমিস্তই হবে সমস্ত জগতের মালিক।"

অর্হমেন বললে—“বেশ ! তাই হবে।”

সেই দিন থেকে জর্বনের দুই ছেলেই লাগল সৃষ্টির কাজে। তাদের রাজ্য ত আর তৈরী রাজ্য নয়। সবই নূতন সৃষ্টি ক'রে গড়ে নিয়ে তবে তাদের রাজত্ব করতে হবে।

অরমিস্ত সৃষ্টি করে—আলো-বাতাস, ফুল-ফল, আশা-আনন্দ।

অর্হমেন তৈরী করে—সাপ, ব্যাঙ, মশামাছি, রোগ-শোক ;

অরমিস্ত সৃষ্টি করে—তারায় ভরা আকাশ, রত্নে ভরা সাগর, শস্যে ভরা পৃথিবী।

অর্হমেন বাতাসে উঠায় ঝড়, নদীতে বহায় বন্যা, পৃথিবীতে আনে ভূমিকম্প।

অরমিস্তের সৃষ্টি সুন্দর। অর্হমেনের সৃষ্টি কুৎসিত।

ইরাণ দেশের পুরাণ বলে—“অরমিস্ত আর অর্হমেন এই দু'ভায়ের সৃষ্টির কাজ এখনও চলছে। একজন গড়ে ভাল আর একজন গড়ে মন্দ। ভাল-মন্দের সৃষ্টি আরও কতকাল চলবে কে জানে ?

অশ্রুমুক্তা

সেতা নদীর সেতু পার হবার সময় হঠাৎ তোতারো, নদীর জলে একটি অদ্ভুত জীব দেখতে পেলে। এমন জানোয়ার সে কখনো জীবনে দেখে নি।

জানোয়ারটার চোখ দুটি পান্নার মত জ্বলজ্বলে। মুখখানা [illegible] ঠিক যেন ড্রাগনের মুখ। সেই মুখে আবার একমুখ [illegible] তোতারো ঐ অদ্ভুত জীবটাকে ভাল ক'রে দেখার জন্যে সেতুর মাঝখানেই ঘোড়া থামালে। দেখলে সেই ভীষণ জানোয়ারটা তারই দিকে মুখ তুলে চেয়ে আছে। তার দীপ্ত চোখের দৃষ্টিতে একটা যেন বেদনার আভাস পাওয়া যায়। তোতারো হাতছানি দিয়ে তা'কে ডাকলে। জানোয়ারটা তার কাছাকাছি এলে তোতারো তা'কে জিজ্ঞেস করলে—"কে তুমি?"

সে মানুষের গলায় জবাব দিলে—"আমার নাম সামেবিতো (সামেবিতোর অর্থ মকরমানব)। সমুদ্রে ড্রাগনরাজের প্রাসাদ আছে জান বোধ হয়? সেইখানে আমি থাকতাম। আমি ড্রাগনরাজের কর্ম্মচারী। একদিন সামান্য একটু দোষে তিনি আমার উপর রাগ ক'রে আমাকে কাজ থেকে বরখাস্ত ক'রে দিলেন। সেদিন থেকে নদীর জলে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

সাগরের জলে আমার প্রবেশ নিষেধ। এখন বড় কষ্টে আমার দিন কাটছে। নদীর জলে না আছে আপনার জন, না আছে বন্ধু-বান্ধব। অচেনা লোক ব'লে কেউ আশ্রয় দিতেও চায় না।"

তোতারো বললে—"যদি আমার সঙ্গে চল তো আমি তোমায় আশ্রয় দিতে পারি। আমার বাগানে খুব বড় একটি

সেতুর মাঝখানেই ঘোড়া থামালে [পৃঃ ৫৫

পুকুর আছে। সেখানে তুমি দিব্যি আরামে থাকতে পারবে। কি বল ?"

সামেবিতো খুব খুশী হ'য়ে তোতারোর কথায় সম্মতি দিলে।

অশ্রুমুক্তা

ওৎসু নগরের মিদারা মন্দিরে বাৎসরিক উৎসব। জাপানের ছেলে-মেয়ে, বুড়ো-বুড়ী, যুবক-যুবতীরা দূর-দূরান্তর থেকে দলে দলে এসে সমবেত হয়েছে। যাত্রীদের মধ্যে তোতারোও আছে। মন্দিরের বাইরে দোকান বসেছে হাজার হাজার। লোকজনের কোলাহলে চারদিক মুখর। ছেলে-মেয়েরা নানারঙের পোষাক প'রে মা-বাবার হাত ধ'রে উৎসব দেখে বেড়াচ্ছে। পুণ্যকামীরা মন্দিরে গিয়ে বুদ্ধমূর্ত্তির পাদদেশে জানু পেতে প্রার্থনা করছেন।

তোতারো মন্দিরের মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে এমন সময় দেখলে একটি মেয়ে এক বৃদ্ধের হাত ধ'রে ধীরে ধীরে বেরোচ্ছে। মেয়েটির গায়ের রং তুষারের মত শুভ্র, পাতলা ঠোঁটদুটি গোলাপের পাপড়ির মত টুক্‌টুকে লাল। চোখ দুটিতে কি অপরূপ স্নিগ্ধতা। তোতারো তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল।

তোতারোর আর মন্দিরের মধ্যে যাওয়া হ'ল না। সে ধীরে ধীরে বৃদ্ধের কাছে এসে তা'কে অভিবাদন ক'রে নিজের পরিচয় দিয়ে, তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে। মেয়েটি একবার [illegible] তার দিকে তাকিয়ে মুখ নত ক'রে চলতে লাগল। অনেকটা পথ এইভাবে চ'লে তোতারো যখন তাদের কাছে বিদায় নিলে তখন তার মনের সকল আশা-আনন্দ নিভে গেছে। তোতারো বৃদ্ধের কাছে তার মেয়েকে বিবাহ করার

প্রস্তাব জানিয়েছিল। বৃদ্ধ বলেছে—"যদি কোন লোক দশ হাজার নির্ম্মল নিটোল শুভ্র মুক্তা যৌতুক স্বরূপ দিতে পা... তা' হ'লে তারই সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। নইলে নয়।"

তোতারো মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলে। তার সংসারে দুঃখ-দৈন্য নেই একথা সত্যি; কিন্তু তাই ব'লে দশ হাজার মুক্তা সে পাবে কোথায়? সাত রাজ্যের রত্নভাণ্ডার একঠাঁই করলেও যে এত রত্ন পাওয়া অসম্ভব। তোতারো নিরাশ হ'য়ে বাড়ী ফিরে এল।

তোতারোর মনে স্ফূর্ত্তি নেই। হৃদয়ে উৎসাহ নেই... ভেবে তার আহার-নিদ্রা বন্ধ। শেষে সে শয্যাশায়ী...

বৈদ্যরা এসে বললেন—"যার কথা ভেবে তোমার অসুখ, তা'কে যদি পাও তবেই তোমার ব্যাধি সারবে, নইলে নয়।"

তোতারো মনে মনে ভাবলে—তা' হ'লে মৃত্যুই নিশ্চিত; কিন্তু বাইরে কোন কথা না ব'লে একটুখানি হাসলে। বৈদ্যরা বিদায় নিলেন।

আশ্রয়দাতার অসুখের সংবাদ সামেবিতোর... পৌঁছেছিল। তাই একদিন সে জলাশয় ত্যাগ ক'... গিয়ে ঢুকে পড়ল তোতারোর ঘরে। তোতারো তা'কে দেখেই বললে—"আমার দিন তো ভাই ঘনিয়ে এসেছে।

যদি তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু আমি গেলে তোমার কি গতি হবে, [illegible] আমাকে ব্যাকুল ক'রে তুলেছে। আর কেউ কি তোমায় এখানে থাকতে দেবে ?"

তোতারোর কথায় সামেবিতোর দু-চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! সামেবিতোর চোখের জল তো জল নয়—তার প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু যে মুক্তা হ'য়ে মাটিতে ঝ'রে পড়ছে !

তোতারোর মনে যেন হঠাৎ বিদ্যুতেব ঝলক্ মেবে গেল। তার নিরাশ মন নূতন আশায় সজীব হ'য়ে উঠল ; নিষ্প্রভ [illegible] যেন উৎসাহে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। তোতারো [illegible] আবেগে বললে—"না না মরব না, আর আমার মরতে হবে না।"

সামেবিতো একটু ভয় পেল। মুমূর্ষু রোগীর পক্ষে এ রকম আকস্মিক আবেগ ভয়ের কারণ। সে ব্যস্ত হ'য়ে তোতারোকে শান্ত করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগল।

তোতারো তা' বুঝতে পেরে বললে—"ভয় নেই সামেবিতো। [illegible] আনন্দের আতিশয্য দেখে তুমি মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ [illegible] তা' আমি বুঝেছি। কিন্তু সত্যি সত্যি তা' নয়। আমি সত্যিই বাঁচবার পথ পেয়েছি। ধন্বন্তরির মহৌষধের পক্ষে যা' অসাধ্য ছিল, তোমার চোখের জল তাই করেছে।"

সামেবিতো শুধু তার ছুটি চোখ তুলে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল। তোতারো এ বলে কি? তার সব [illegible] হেঁয়ালির মত মনে হয়।

সামেবিতোর বিহ্বলভাব দেখে তোতারো তা'কে সব কথা খুলে বললে। এও বললে যে, দশ হাজার নির্ম্মল মুক্তো যৌতুক স্বরূপ না দিলে সে যে মেয়েটিকে ভালবাসে তা'কে বিয়ে করতে পারবে না। আজ সামেবিতোর চোখের জলে তার বিবাহ-যৌতুক সংগ্রহ হ'ল।

এই ব'লে তোতারো শয্যা ছেড়ে উঠে মুক্তাগুলি জড়ো ক'রে গুণতে লাগল। গুণা শেষ হ'লে দেখা গেল তার আনন্দের আবেগ যেন আবার অনেকটা ক'মে এসেছে। সে হতাশ হ'য়ে ব'লে উঠল—"এখনও যে কিছু বাকী। দশ হাজার তো হয় নি।"

সামেবিতোও যেন একটু কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ল।

তোতারো কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইল। তারপর হঠাৎ চীৎকার ক'রে ব'লে উঠল—"সামেবিতো! বন্ধু! বাঁচাও আমায়। আর একটু কাঁদো ভাই। বেশী নয়, আর একটি বার।"

সামেবিতো তোতারোর এ কথায় মোটেই খুশী হ'ল না। আশ্রয়দাতাকে মুমূর্ষু দেখে হৃদয় তার ব্যথায় ভ'রে গিয়েছিল।

তাই চোখের জল তার অজ্ঞাতসারেই ঝরেছিল। সে. কি
[illegible] বলেই কান্না বেরোবে ? তোতারো তা'কে
[illegible] সামেবিতো গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইল—
তোতারোর কথার কোন জবাব দিলে না।

তোতারো অস্থির হ'য়ে উঠল। সামেবিতোর গায়ে নাড়া দিয়ে বললে—"সামেবিতো ! সামেবিতো ! শোন, শোন কথা আমার। কাঁদ ভাই, আর একবার কাঁদ। তুমি না কাঁদলে তামানাকে পা'ব না। তামানাকে না পেলে আমার মরণ নিশ্চিত। বলো আমার মৃত্যুই কি তুমি চাও ?"

সামেবিতো ব্যথিত হ'য়ে জবাব দিলে—"উপকারীব ঋণ সামেবিতো কখনও ভোলে না। প্রয়োজন হ'লে সে প্রাণ দিয়েও তা' শোধ করতে প্রস্তুত।"

—"তবে আর দেরী করছ' কেন ভাই ? প্রাণ দেওয়ার জন্যে যে প্রস্তুত, একটুখানি কাঁদতে তার এত আপত্তি কিসের ?"

—"কান্নাটা কি ক্রীতদাস তোতারো, যে, হুকুম করলেই অমনি সে দেখা দেবে ? তা' নয়। তোমাকে মৃত্যু-শয্যায় দেখে দুঃখ পেয়েছিলাম, তাই চোখের জল আপনিই বেরিয়েছিল। এখন দেখছি তুমি সুস্থ হয়েছ অনেকটা, এখন চেষ্টা করলেও চোখের জল আর আনতে পারব না।"

তোতারোর মুখ নিষ্প্রভ হ'য়ে গেল। তার মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটি শব্দ উচ্চারিত হ'ল—"**তামানা!**"

সামেবিতো বললে—"শোন তোতারো!"

—"কি আর শুনব বল?"

—"আমি হয়তো কাঁদতে পারব।"

—"পারবে?"

—"বোধ হয় পারব; কিন্তু এখানে নয়।"

—"এখানে নয়? তবে কোথায়?"

—"চল সেই সেতা নদীর সেতুর উপরে। আজ তোমায় দেখে তোমার কথা শুনে, আমার মনটাও অস্থির হ'য়ে উঠল। তুমি যা'কে ভালবাস তা'কে পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়েছ। আজ তাই দেখে মনে পড়ল আমার প্রিয়জনদের। কতদিন তাদের ছেড়ে এসেছি। চল আজ সেই সেতুর উপর ব'সে সুদূর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাদের কথা ভাবি। তা' হ'লে চোখের জল আপনিই ঝরবে। ওঠ ওঠ তোতারো, আর দেরী ক'রো না।"

সেতা নদীর সেতুর উপরে ব'সে সামেবিতো চাইলে সমুদ্রের দিকে। কিছুই দেখা যায় না। সেতা যেখানে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে সেই বহুদূরে, ঐ যেখানে আকাশ এসে মিশেছে জলের বুকে, তারই দিকে আকুল দৃষ্টি মেলে চেয়ে

রইল সামেরিতো। ঐ সাগরের তলায় ড্রাগনরাজের পুরী। সেখানে তার যাওয়ার পথ রুদ্ধ হ'য়ে গেছে চিরদিনের মত। হয়তো আজও তার স্ত্রী একলা ঘরে ব'সে তার জন্যে কেঁদে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে। হয়তো তার শিশুপুত্র মাকে ডেকে বলছে—'বাবা কি আর ফিরবে না মা ?'

মায়াপুরী সেতুর কাছে এসে প'ড়েছে। [পৃঃ ৬৪

ভাবতে ভাবতে সামেরিতোর চোখ জলে ভ'রে এল। অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ল তার বুক বেয়ে। এমন সময় হঠাৎ নদীর বুকে ওকি ভেসে উঠল ? একি কোনও রাজার রাজপুরী নাকি ? এযে প্রকাণ্ড প্রাসাদ। মেঘের মত ধব্‌ধবে তার

প্রাচীর। উঁচু উঁচু সোনার চূড়া—তা'তে সন্ধ্যা-রবির আভা পড়েছে। চাইলে চোখ ঝলসে যায়। ঐ যে প্রাচীরের উপর থেকে কারা যেন হাতছানি দিচ্ছে না? তাই তো; কারা ওরা?

তোতাবো বিস্মিত হ'য়ে সামেবিতোর দিকে তাকালে! সামেবিতোর চোখে জলের ধারা তখন শুকিয়ে এসেছে। দুঃখের ছায়া মিলিয়ে গিয়ে তার মুখে ফুটে উঠেছে হাসির রেখা। সে তোতারোব দিকে চেয়ে বললে—"বন্ধু, প্রবাস-দুঃখ আজ আমার শেষ হ'ল। তুমি আমার যে উপকার করেছ সে কথা কোন দিন ভুলব না। আজকের অশ্রুমুক্তাগুলি কুড়িয়ে নিয়ে যাও তামানার কাছে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তা'কে নিয়ে সুখী হও।"

ততক্ষণে মায়াপুরী ভাসতে ভাসতে সেতুর কাছে এসে পড়েছে। তোতারো স্পষ্ট দেখতে পেলে কয়েকটি ভীষণমূর্ত্তি ড্রাগন সামেবিতোকে হাত নেড়ে নেড়ে ডাকছে। সামেবিতো তাদের দিকে চেয়ে বললে—"এই যে যাই।"

তারপর তোতারোর কাছে বিদায় নিয়ে সামেবিতো সেই মায়াপুরীব উপরে লাফিয়ে পড়লে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব ফাঁকা। তোতারো দেখলে কোথাও কিছু নেই। শুধু অশ্রুমুক্তাগুলি সেতুর উপর ছড়িয়ে রয়েছে।

মুক্তিপাশ

মুক্তিপাশ

প্রথম দৃশ্য

প্রাসাদের অন্তঃপুর

রাজা ও রাণী

রাণী—মহারাজ, আমার সব চেষ্টা ত ব্যর্থ হ'ল। এখন তুমি একবার দেখ যদি পার। তোমার কথা হয়ত বা শুনতেও পারে।

রাজা—আমি বলি মহারাণী, আর প্রয়োজন নেই কোন চেষ্টার। দেবতার চরণে যে জীবন উৎসর্গ করতে চায়, সংসারের পঙ্কিলতার মধ্যে কেন তা'কে টেনে আনা? তা'তে তার জীবন হবে নিষ্ফল, আর সংসারেরও হবে না কোন লাভ।

রাণী—সে কি কথা মহারাজ! একথা কি তোমার মুখে শোভা পায়? একটি মাত্র কন্যা। সে হবে সন্ন্যাসিনী! আমি মা—কেমন ক'রে তাই দেখে প্রাণ ধরব। সে যদি মন্দিরে আশ্রয় নেয়, তার সঙ্গে আমাকেও বিদায় দিতে হবে।

রাজা—কিন্তু মহারাণী!···

রাণী—কোন 'কিন্তু' নেই মহারাজ! আমি কোন কথাই শুনব না। দশ মাস দশ দিন ধ'রে যাকে উদরে স্থান দিয়েছি, আমারই বুকের রক্তে যে তিলে তিলে গ'ড়ে উঠেছে, কেমন ক'রে তা'কে বিদায় দেবো বল? বল, তুমিই বল, কেমন ক'রে তার মুখ না দেখে কাটাবো সঙ্গহীন দিবস, নিদ্রাহীন রজনী! ওগো না না, কিছুতেই তা' হবে না। সে এখনও বালিকা। এখনও তার বুদ্ধি কাঁচা।

রাজা—কার বুদ্ধি কাঁচা বলছ রাণী?—রত্নার? হায় প্রিয়ে চিন্‌তে পার নি তা'কে। স্নেহের অঞ্জনে তোমার নয়ন র'য়েছে লিপ্ত। সে তোমাকে তার স্বরূপ দেখতে দেয় নি। দেব-মন্দিরে সন্ধ্যারতির সময়ে কোন দিন কি দেখ নি তার মুখের পানে চেয়ে? অবিকম্পিত দীপশিখার মত প্রশান্ত সমুজ্জ্বল তার নয়ন ছুটি যখন দেবতার চরণে নিবদ্ধ থাকে দেখি, তখন আমার মত সংসার-কীটের মনও কখন যে উদাসীন হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে জানতেও পারি না। তার বুদ্ধি কাঁচা নয় রাণী, নিজেদের জ্ঞান দিয়ে তার বুদ্ধির পরিমাণ করতে গেলে ভুল করবে।

রাণী—ভুল করি সেও ভাল, তবু তা'কে এপথে যেতে দেবো না। মায়ের হৃদয়কে চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে—চিত্তকে দলিত মথিত ক'রে—কোথা যাবে সে উন্মাদিনী? আমি মা, আমি তা'কে.

আগলে রাখব আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে—দেখি কেমন ক'রে সে যায় ?

রাজা—কোন বন্ধনই সে মান্‌বে না মহিষী। মুক্তিপথের যাত্রী সে। দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত নতশিরে তা'কে পথ ছেড়ে দেবে, গহন অরণ্য দেবে তার পথে পুষ্পাস্তরণ বিছিয়ে।

রাণী—কিন্তু মাতৃস্নেহ যে সমুত্তুঙ্গ পর্ব্বতের চেয়েও দুরতিক্রম্য—গভীর অরণ্যের চেয়েও দুর্গম।

রাজা—কিন্তু স্নেহ দিয়ে কি বাঁধতে পেরেছ তা'কে ? তার নির্লিপ্ত মন কি সে বন্ধনে ধরা পড়ে ? তুমি রাখবে তার দেহটাকে, মন কি বন্দী থাকবে মহারাণী ! গন্ধ যদি পেতে চাও ফুলকে পেটিকায় বন্ধ ক'বো না।

রাণী—তুমি পুরুষ। জননীর অন্তবের পরিচয় তুমি কেমন ক'বে পাবে মহারাজ ! মাতার মর্ম্মতলে যে ফল্গুব বারিধারা নিয়ত উৎসারিত তার কণামাত্র যদি তোমায় স্পর্শ করত—

রাজা—করে নি কি প্রিয়তমে ?

রাণী—না, করে নি। তোমাদের হৃদয় যে অন্য ধাতু দিয়ে তৈরী। (নেপথ্যে চাহিয়া) কে ও ? মঞ্জু ?

(মঞ্জুর প্রবেশ)

মঞ্জু—হাঁ, রাণীমা। রাজকুমারীকে খুঁজতে খুঁজতে এদিকে এলাম। দেখেছেন কি তাঁ'কে ?

রাণী—না মা, সে ত এদিকে আসে নি। মার কাছে কতটুকুই বা থাকে সে পাষাণী? হয়ত বা একলা ব'সে আছে নির্জ্জন মণিকোঠায়।

মঞ্জু—না রাণীমা, সেখানে নেই।

রাজা—পুষ্করিণী-তীরে?

মঞ্জু—না, সেখানেও দেখেছি।

রাজা—উদ্যানের পূর্ব্বকোণে সপ্তপর্ণিতল, দেখেছ কি সেখানে?

মঞ্জু—না মহারাজ, ভুল হ'য়েছে ভারি। সেখানে যাই নি। আচ্ছা তা' হ'লে আর দেরি করব না। সন্ধ্যা হ'ল ব'লে।

রাণী—চল মা, আমিও যাই তোমার সঙ্গে। কতক্ষণ তা'কে দেখি নি।

(রাণী ও মঞ্জুর প্রস্থান)

রাজা—(স্বগত) এ কি পরীক্ষায় ফেললে ভগবান্! মেয়ে যে পথে চ'লেছে কি ব'লে তা'কে বাধা দিই? স্বর্গের পারিজাত সে, মর্ত্ত্যের তপ্ত বাতাসে তা'কে মলিন করি কেমন ক'রে, পিতা হ'য়ে? এদিকে মহারাণীকেই বা বুঝাই কেমন ক'রে! মাতার মন, সে কি যুক্তি-তর্কে বশ মানে?

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদ্যান

সখী ও রাজকুমারী

সখী—মেঘ উঠেছে জ'মে। ঐ দেখ আকাশের পশ্চিম কোণটা কালো হ'য়ে উঠল। চল সখী প্রাসাদে। উদ্যানে থাকলে বিপদ হবে। ঝড় এল ব'লে।

রাজকুমারী—আসুক না ঝড়—ভয় কি? এ ঝড়ও ত আমার প্রভুর দেওয়া। তাঁকে প্রতিদিন দেখি নব নব রূপে। দীপ্ত দ্বিপ্রহরে যাঁর অগ্নিমূর্ত্তি দেখে জগৎ চঞ্চল হ'য়ে উঠে, পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় তাঁরই কোমল করপল্লব-স্পর্শে পৃথিবী হয় সুপ্তিমগ্ন। জলে স্থলে, পুষ্পে পল্লবে, গগনে পবনে সর্ব্বত্র তিনিই লীলা করেন ভিন্ন ভিন্ন রূপে। এ ঝড়ের মধ্যেও তাঁরই প্রকাশ। মিছে ভয় পাস্ সখী।

সখী—মানুষের মধ্যেও ত তাঁরই প্রকাশ, তবে তা'কে এড়িয়ে চল্‌তে চাস্ কেন?

রাজকুমারী—এড়িয়ে চ'লেছি আমি? মানুষকে?

সখী—হাঁ, মানুষকেই বলতে হবে বৈ কি? পূর্ব্বাঞ্চলের রাজকুমার কি মনুষ্যজাতির বাইরে?

রাজকুমারী—ওঃ! এতক্ষণে বুঝেছি তোর কথা। হাঁ, তা'

তিনিও মানুষ এ কথা সত্যি। কিন্তু সে রকম মানুষ ত জগতে বিরল নয় ভাই। আমি চাই সকল মানুষেরই সেবা করতে।

সখী—বিয়ে করলেই কি মানুষের সেবায় বাধা হয় না কি ?

রাজকুমারী—বিবাহটাই যে বাধা। পুরুষ যখন নারীকে বিবাহ করে তখন সে চায় তার সমস্ত অধিকার হরণ ক'রে নিতে। সে ভাবে পত্নী একমাত্র তারই সেবিকা, তারই দাসী। সে জানে এ-ই নারীর ধর্ম্ম।

সখী—কিন্তু পুরুষ মাত্রেই কি তাই ? পূর্ব্বাঞ্চলরাজের মত এমন ধার্ম্মিক, এমন স্বজন-বৎসল, এমন অমায়িক প্রকৃতির লোক অল্পই দেখা যায়। তিনিও তোরই মত সারাজীবন জীবসেবাই ক'রে এসেছেন। সংসারকে তিনিও ত মৃৎপিণ্ডের মতই জ্ঞান করেন। তাঁর প্রজারা তাঁকে দেবতার বরপুত্র ব'লে জানে। তোতে তাঁতে পার্থক্য এই যে, তিনি পুরুষ হ'লেও তাঁর অন্তর পাষাণ নয়। মায়ের চোখের জল তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই তিনি বিবাহ করতে সম্মত হ'য়েছেন। তাও অবশ্য তোর কথা শুনেই।

রাজকুমারী—জগতে রাজকন্যার ত অভাব ছিল না।

সখী—তা' ছিল না সত্যি। অভাব কেন বরং প্রাচুর্য্যই ছিল। কিন্তু তিনি বিয়ে করবেন ব'লে কন্যা খুঁজতে বেরোন নি। উপযুক্ত কন্যা পাচ্ছেন ব'লেই বিয়ে করতে সম্মত

হ’য়েছেন। মহারাজ প্রধান মন্ত্রীকে পাঠিয়েছিলেন পূর্ব্বাঞ্চলে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে।

রাজকুমারী—কে পাঠিয়েছিলেন?—বাবা?

সখী—হাঁ, বিবাহে তোর যে একান্ত অনিচ্ছা তা’ জেনেও তিনিও পাঠিয়েছিলেন; কারণ, তিনি বুঝেছিলেন এ জায়গায় তোর আপত্তির কোন কারণ থাকতে পারে না।

রাজকুমারী—তার অর্থ?

সখী—অর্থ এই যে, তাঁকে পতিরূপে পেলে তোর ধর্ম্মপথে কাঁটা পড়বে না। তাঁর রাজপ্রাসাদ ত নয়, সে একটা সদাব্রত। গরীব দুঃখী সেখানে রাত-দিন ভীড় ক’রে আছে। তাঁর রাজকোষ দীন-দরিদ্রের জন্যে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত। সুখৈশ্বর্য্যে তাঁর রুচি নেই, ভোগ-বিলাসে লালসা নেই। তিনি প্রাসাদে থেকেও সন্ন্যাসী। তোর কথা শুনে মন্ত্রীকে কি ব’লেছেন জানিস্? ব’লেছেন, ‘আপনাদের রাজকন্যা এবং আমার জীবনধারা একই পথে প্রবাহিত। তাঁকে সহধর্ম্মিণীরূপে পেলে কৃতার্থ হ’ব।’

রাজকুমারী—কিন্তু আমি যদি কৃতার্থ না হই।

সখী—তা’ হ’লে আর কিছু না হোক্, মাতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হ’তে হবে।

রাজকুমারী—আচ্ছা সখী, তুই যাঁর কথা বল্‌ছিস তিনি কি

সত্যিই সন্ন্যাসী, সত্যিই কি তিনি মনপ্রাণ ভগবানের চরণে সমর্পণ ক'রেছেন ?

সখী—বললুম:ত তিনি ইচ্ছা করলে অসাধ্য সাধন করতে পারেন। সেবারে যখন পশ্চিমের বন্যা সব গ্রাম ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে পড়ল তাঁর রাজ্যের উপর, অসহায় প্রজারা কোন রকমেই সে বন্যা রোধ করতে পারলে না। তাদের গরু-বাছুর গেল ভেসে, তাদের ঘরবাড়ী হ'য়ে গেল ভূমিসাৎ, তা'রা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধ'রে এসে দাঁড়াল প্রাসাদের চতুর্দ্দিক ঘিরে। রাজা শুনলেন তাদের করুণ কাহিনী। বললেন, 'আজকের মত তোমরা সকলেই আতিথ্য গ্রহণ কর। কাল সকালে যে যার গৃহে ফিরবে।' এই ব'লে তিনি উপাসনা-মন্দিরে প্রবেশ ক'রে দ্বার রুদ্ধ করলেন। পরদিন সকালে যে যার বাড়ী ফিরে দেখলে, যেখানে যা ছিল সবই ঠিক আছে। পঙ্গপালের উৎপাতে যেবার দেশময় দুর্ভিক্ষ হ'ল তখন পূর্ব্বাঞ্চলরাজ যে অক্ষয় ভাণ্ডার স্থাপন ক'রেছিলেন শুনিস্ নি সে কথা ?

রাজকুমারী—চারণের মুখে শুনেছি সে কাহিনী। দেশ-দেশান্তর থেকে নরনারী ছুটেছিল তখন পূর্ব্বাঞ্চলে। সে ভাণ্ডার থেকে যে যত পেরেছে শস্য নিয়েছে, কিন্তু তবু নাকি তা' ফুরোয় নি !

সখী—হাঁ, এমনি তাঁর শক্তি।

রাজকুমারী—আচ্ছা—আমি যা' চাইব পাব তাঁর কাছে ?

সখী—শুক্তিগর্ভে যে মুক্তা র'য়েছে রত্নাকরের তলদেশে, তাও তিনি এই মুহূর্ত্তে তুলে আনতে পারেন।

রাজকুমারী—মুক্তার কি মূল্য সখী ?—সৌন্দর্য্য ? পদ্ম-পাতায় যে শিশিরবিন্দুটি অরুণালোকে ঝল্‌মল্ করে, কোন্ রত্ন তার চেয়ে বেশি সুন্দর ?

সখী—তবে কি চাস্ তুই ?

রাজকুমারী—আমি চাই সহস্র দেবালয়। এক রাত্রির মধ্যে তাঁকে নির্ম্মাণ ক'রে দিতে হবে।

সখী—তোর অভিলাষ যদি পূরণ করেন ?

রাজকুমারী—তাঁর অভিলাষ পূর্ণ হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

সীমাহীন প্রান্তরে অসংখ্য মন্দির। সময়—নিস্তব্ধ রাত্রি।
রাজকুমারী ও একজন পরিচারিকা।

রাজকুমারী—(স্বগত) না অসম্ভব। কথা দিয়ে যে ভুল ক'রেছি, কথা রাখতে গেলে সে ভুল বাড়বে বই কমবে না। ভগবান্! ক্ষমা কর। মিথ্যাবাদিনীর শাস্তি দাও। পূর্ব্বাঞ্চল-রাজ তাঁর কথা রেখেছেন। ঐ ত প্রায় সব মন্দিরই প্রস্তুত। আর একটি মাত্র বাকি। ঊন-সহস্র মন্দির যে নির্ম্মাণ করতে

পারে কয়েক দণ্ডের মধ্যে, সহস্র করতে তার কতক্ষণ? কিন্তু কোন উপায় কি নেই বাধা দেবার?

(চিন্তা—কয়েক মুহূর্ত্ত পরে প্রকাশ্যে) সাহসিকা!

সাহসিকা—আজ্ঞা করুন, রাজকুমারী!

রাজকুমারী—একটা কাজ করতে হবে, এই মুহূর্ত্তেই।

সাহসিকা—আদেশ করুন। আজ্ঞা পালনের ত্রুটি হবে না।

রাজকুমারী—নগরীর সুপ্তিমগ্ন নারীদের জাগাতে হবে।

সাহসিকা—রাত্রি যে গভীর?

রাজকুমারী—তবু যেতে হবে। প্রত্যেককে জাগিয়ে নিযুক্ত করবে গৃহকর্ম্মে। তাদের উদূখলের শব্দে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যেন প্রভাত সূচিত হয়। যাও, বলবে—আমার অনুরোধ।

সাহসিকা—কিন্তু……

রাজকুমারী—আর কোন প্রশ্ন নয়। যাও তুমি ঐ পথে। আমি প্রাসাদে ফিরব একলা। আমিও যতগুলি রমণীকে পারি জাগাব। (উভয়ের প্রস্থান)

(পূর্ব্বাঞ্চলরাজের প্রবেশ)

পূর্ব্বাঞ্চলরাজ—(স্বগত) উন-সহস্র মন্দির প্রস্তুত। আর একটি মাত্র বাকি। দেবদূতরা এখনই তা' সম্পূর্ণ ক'রে ফেলবে। রাজকুমারীর ইচ্ছা অপূর্ণ থাকবে না, এই আমার আনন্দ।

(দূরে উদূখলের শব্দ। ক্রমে শব্দ বাড়িতে লাগিল। রাজা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।)

একি ? রাত্রি কি প্রভাত হ'ল নাকি ? কিন্তু কই পূর্ব্বদিক ত এখনও রাঙ্গা হয় নি ! না, সমস্ত নগরের লোক শয্যা ত্যাগ ক'রেছে, রমণীরা আরম্ভ ক'রেছে গৃহকর্ম্ম। ঐ ত উদূখলের শব্দ ক্রমশঃ বাড়ছে। হায় ! আজ আমার অভিমান চূর্ণ হ'ল ! (প্রকাশ্যে) দেবদূত !

(দেবদূতের প্রবেশ)

দেবদূত—আদেশ করুন।

পূর্ব্বাঞ্চলরাজ—কাজ কতদূর ?

দেবদূত—একটি মন্দির বাকি।

পূর্ব্বাঞ্চলরাজ—আর প্রয়োজন নেই। সময় অতীত হ'য়েছে। তোমরা যেতে পার।

দেবদূত—যথা আজ্ঞা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর। সময়—প্রভাত আসন্ন।

রাজকুমারী—(স্বগত) কৌশল ব্যর্থ হয় নি, কিন্তু মন কেন সায় দিচ্ছে না ?

(ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে সখীর প্রবেশ)

সখী—দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাই ছুটে এলাম। কিন্তু একি ? সারা রাতটা কি জেগেই কাটিয়েছিস ?

রাজকুমারী—জাগতে দে সখী। এবার এমন নিদ্রা আসবে যা' কখনও ভাঙ্গবে না।

সখী—এমন কথা কি উচ্চারণ করতে আছে ? আজ তোর নতুন ক'রে জীবন আরম্ভ হবে সখী। পূর্ব্বাঞ্চলরাজ তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক'রেছেন। চল্ বাইরে গিয়ে দেখি।

রাজকুমারী—দেখে দুঃখ পাবি বোন্। সম্পূর্ণ হয় নি তাঁর কাজ।

সখী—অসম্ভব।

রাজকুমারী—অসম্ভবই ছিল। কিন্তু সম্ভব ক'রেছে—এই হতভাগিনী।

সখী—তবে ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা নয় ? হায় সর্ব্বনাশী, এ কি করলি ? চল্ চল্ দেখি হয়ত বা এখনও সময় আছে।

রাজকুমারী—না সখী, সময় আর নেই। ঐ দেখ। পূর্ব্ব দিক রক্তিম হ'য়ে এসেছে। পাখীরা ছেড়েছে কুলায়।

সখী—তবু চল বোন, তবু চল।

রাজকুমারী—হাঁ, তবু যা'ব—কিন্তু একলা। তোরও যাওয়া চলবে না আমার সঙ্গে। আমার বিবাহে সাক্ষী থাকবে

একলা ঐ পাণ্ডুর শশাঙ্ক। আমার কলঙ্কের ছাপ প’ড়ে, তারও মুখ হয়েছে কালো। আসি বোন, বিদায় দে। (প্রস্থান)

সখী—এ কি রহস্য! মঙ্গলময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

নির্জ্জন প্রান্তর। সময়—উষাকাল।

পূর্ব্বাঞ্চলরাজ—কে তুমি রমণী?

(রাজকুমারীর প্রবেশ)

নিরুত্তর কেন?

(স্বগত) তা’কে দেখি নি কখনও। তবু অনুমান হয় এ-ই সে।

(প্রকাশ্যে) তুমিই কি এ রাজ্যের রাজনন্দিনী?

রাজকুমারী—এখন আমার অন্য পরিচয়। আমি অপরাধিনী। মহারাজের কাছে এসেছি দণ্ড নিতে।

পূর্ব্বাঞ্চলরাজ—কোন্ অপরাধের?

রাজকুমারী—প্রবঞ্চনার।

পূর্ব্বাঞ্চলরাজ—তোমার প্রবঞ্চনায় আমার লাভই হয়েছে রাজকুমারী। আমি মুক্ত। যে ক্ষণিকের মোহে আত্মহারা হ’য়ে তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম—সে মোহ এখন দূর

......তোমাকে ঘিরে গ'ড়ে উঠুক সেই সহস্রতম মন্দির।

জাপানী রূপকথা

দু'জনেই রাজার ছেলে। রাজপুত্রের মতই তাদের রূপ। শরীরে যেমন বল, অন্তরে তেমনি সাহস। রাজপ্রাসাদের স্বর্ণ সিংহাসনেই তাদের মানায়—কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তা'রা নির্ব্বাসিত। এখন বিজন বনের পর্ণকুটীরে তাদের বাস। সে কুটীরের পিছনে বিরাট পর্ব্বত, সাম্‌নে অন্তহীন সমুদ্র।

বড়র নাম হিনোদে। দেখলেই বোঝা যায়—বীরপুরুষ বটে। বীরত্ব ভাল—কিন্তু অহঙ্কার ত ভাল নয়। হিনোদে ছিল একটু অহঙ্কারী। শুধু তাই নয়, তার প্রকৃতিটাই ছিল একটু হিংসুটে রকমের।

আইরিহি ছোট। সেও ভীরু নয়, কিন্তু মনটি তার কোমল। সে দাদাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দাদা রাগ করলে সে কখনও উল্টে রাগ করত না। সে জানত রাগ দিয়ে রাগ জয় করা যায় না।

পূবের দিগন্ত মিশেছে সাগরের নীল জলে। আকাশও নীল, জলও নীল, কিন্তু প্রভাতের আলোয় তাদের মিলনভূমি হ'য়ে ওঠে রক্তবর্ণ। দিগন্তের এই লাল আলো ঠিকরে গিয়ে পড়ে তাদের পাতার ঘরে। পাতার ফাঁক দিয়ে গিয়ে পড়ে তাদের চোখে মুখে, পড়ে তাদের সর্ব্বাঙ্গে, আর পড়ে ঐ কালো পাহাড়ের চূড়ায়। পাখীরা ধরে গান। অমনি ভেঙ্গে যায় তাদের ঘুম। পাখীরা নীড় ছাড়ে, তা'রাও কুটীর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

দু'জনের দুই পেশা—হিনোদে ধরে মাছ—জালে নয় বঁড়শিতে। কত রকমের মাছ যে তার হাতে পড়ে তা' আর বলব কি! সমুদ্রে ত মাছের অভাব নেই। করাত মাছ, হাঙ্গর মাছ, বোয়াল মাছ—তা' ছাড়া আরও কত মাছ। সব মাছের নাম বলবে কে! জানেই বা কয়জন? কোন মাছের ওজন একমণ, কোনটার দু' মণ, কোনটা বা তার চেয়েও বেশী।

আইরিহির সম্বল তীর ধনুক। বাঘ ভালুক তা'কে ভয় করে। পাগলা হাতী তা'কে দেখলে দেয় পিট্‌টান। তার হাতে নিষ্কৃতি নেই কারও। অমন যে সিংহ—ভালুক হাতী সকলেরই যে রাজা—আইরিহির সামনে পড়লে তা'কেও আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হয় না। এমনি তার সাহস, এমনি তার শক্তি।

পূবের সূর্য্য যখন উঁচু পাহাড়ের চূড়া পেরিয়ে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়েন, তখন আইরিহি ফিরে পাতার ঘরে। কাঁধে তার হরিণ কি শশক। বাঘ ভালুক যা' মারে তা' বনের মধ্যেই প'ড়ে থাকে—এনে কিং হবে ? সেগুলো ত আর খাওয়া যায় না। ওদিক থেকে হিনোদেও ফিরে মাছ নিয়ে। সব মাছ

নয়, যে সব মাছ খেতে ভাল সে গুলোই আনে ; বাকী সব প'ড়ে থাকে, সমুদ্রের ধারে বালির উপরেই।

একদিন এক খেয়াল হ'ল আইরিহির। সে বল্‌লে—"দাদা, বনে-জঙ্গলে ঘুরে পাহাড়ের মাথায় মাথায় লাফালাফি ক'রে

আর ভাল লাগে না। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক্। তুমি একদিন তীর-ধনুক নিয়ে বনে যাও, আর আমি যাই তোমার বঁড়শি নিয়ে মাছ ধরতে। মধ্যে মধ্যে হাত বদলালে কাজ আর এত একঘেয়ে লাগে না—কি বল ?"

হিনোদে বললে—"ঠিক বলেছিস আইরিহি। তা' বেশ আমার কোন আপত্তি নেই। আমার কাছে বঁড়শিও যা' তীর-ধনুকও তাই। বঁড়শিতে যেমন মাছ পড়ে তীর-ধনুকেও তেমনি শিকার পড়বে। তুই কি না ছেলে মানুষ, মাছ তোর হাতে পড়লে হয়।"

আইরিহি বললে—"পড়ুক আর নাই পড়ুক দাদা, হাত বদলে একবার দেখাই যাক। তুমি নাও তীর-ধনুক, আর আমায় দাও তোমার ছিপ-বঁড়শি।"

সন্ধ্যে হ'ল। নীড়ের পাখী ফিরল নীড়ে। গুহার জীব আশ্রয় নিলে গুহায়। আকাশে নামল ছায়া। অরণ্য হ'ল নীরব। কেবল সমুদ্রের কল্লোল ছাড়া আর কোন শব্দ কোথাও নেই। কিন্তু দু'ভায়ের কেউ ফেরে নি কুটীরে। আজ কারও কোন শিকার জোটে নি।

একটি দুটি ক'রে আকাশের একোণে ওকোণে দেখা দিলে তারা। দেবদারু গাছের আড়ালে উঁকি দিলে চাঁদ। দেখতে দেখতে তারার মালায় ছেয়ে গেল নীল গগন। শ্যামা

[illegible]য়ের সর্ব্বাঙ্গ কে যেন দিলে ফুলের সাজে সাজিয়ে। সাগরের বুকে পড়ল তার ছায়া। তার ঢেউয়ের দোলায় কে যেন তা'কে দোল দিতে লাগল আদর ক'রে।

আগে ফিরল আইরিহি। মুখটি শুকনো, চোখ দুটি সজল। মাছ পড়েনি একটিও। কিন্তু দুঃখ তার জন্যে নয়। তার দাদার বঁড়শি মাছে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। দাদা যখন বঁড়শি চাইবে—কি বলবে সে? যা' হয় হবে ব'লে, ঘরে ঢুকল আইরিহি। কিন্তু কই? হিনোদে কোথায়! সে কি এখনও ফেরে নি তবে! আইরিহির মনে বড় ভয় হ'ল। জঙ্গলে যে সব ভয়ঙ্কর জন্তু! আর হিনোদে ত কখনও বনে শিকার করতে যায় নি! তবে কি তা'কে!—ভাবতে হ'ল না—ঘরে ঢুকল হিনোদে। তারও হাত শূন্য। মুখে বেদনার চেয়ে বিরক্তির ভাবটাই বেশী। ঢুকেই সে বললে—"নে নে তোর অস্ত্র। যেমন ধনুক, তেমনি বাণ। যতগুলো তাক্ করলাম একটাও লাগল না। দরকার নেই বাঘ ভালুক শিকারে। আমার মাছ ধরাই ভাল। তুই ক'টা মাছ ধরলি! নিশ্চয়ই অনেকগুলো পেয়েছিস। কি রকম বঁড়শিখানা দেখতে হবে ত! একবার ছুঁলেই গাঁথা না হ'য়ে যায় না।"

আইরিহির মুখখানি আরও শুকিয়ে গেল। বললে—"দাদা, বড় দোষ হয়েছে ক্ষমা কর। তোমার বঁড়শিটি

মাছে কেটে নিয়ে গেছে। একটিও মাছ ধরতে পারি [illegible] সে যে তোমার ছিপের দোষ, তা' নয়—মাছ ধরতে জানি না ব'লেই।"

শুনে ত হিনোদে রেগে আগুন। ভাইকে মারতে যায় আর কি! বললে—"কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। বঁড়শি আমার চাই-ই। যেখান থেকে পার আমার বঁড়শি এনে দাও।"

আইরিহি বললে—"মাছে যে কাঁটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে, কেমন ক'রে তা' ফিরে পাব? আমি ত আর—"

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে হিনোদে এক ধমক দিয়ে জানিয়ে দিলে—'তার বঁড়শি চাই।'

আইরিহি আর কি করে? তার তীরের ফলা ভেঙ্গে তখনই একটার জায়গায় একশ'টা বঁড়শি তৈরি ক'রে হিনোদে[illegible] কাছে এনে দিলে।

খুসী হওয়া ত দূরের কথা, হিনোদে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলে আইরিহির গায়ের উপর। দু'চারটে কাঁটা তার হাতে পায়ে বিঁধল। একটা লাগল ঠিক গালের উপর, আর একটু হ'লেই চোখটা তার যেত। আইরিহির গায়ে গড়িয়ে পড়ল রক্তের ধারা।

আইরিহি চোখের জল মুছে আবার কাঁটা তৈরি করতে লাগল। এবার করলে একশ'র জায়গায় হাজারটা। ভা[illegible]

[illegible] বঁড়শি পেলে দাদার রাগ আর থাকবে না নিশ্চয়ই। কি[illegible]ল বুঝেছিল। হিনোদে তার নিজের বঁড়শি ছাড়া আ[illegible] বঁড়শিই নেবে না। সে একশ'ই হোক্, আর হাজারই হোক্।

আইরিহি কাঁদতে কাঁদতে গেল সমুদ্রের তীরে। ব'সে ভাবতে লাগল—কেমন ক'রে পাবে হারানো বঁড়শিটি।

ব'সে থাকতে থাকতে তন্দ্রা এল তার চোখে। পরিশ্রান্ত দেহ কখন যে বালুবেলায় লুটিয়ে পড়ল তা' সে নিজেই বুঝতে পারল না। কোথাও কেউ নেই—আকাশের তারাগুলি [illegible]ষ নয়নে তার দিকে চেয়ে রইল। চাঁদ হেলে পড়ল [illegible]। পাণ্ডুর হ'য়ে এল তার রং।

হঠাৎ কার হাতের ছোঁয়া লেগে ঘুম ভেঙ্গে গেল আইরিহির। সে ভাবলে তার দাদা বুঝি। কিন্তু চেয়ে দেখে, না—দাদা ত নয়। সৌম্যমূর্ত্তি এক বৃদ্ধ। প্রশান্ত তাঁর মুখ—সাদা দাড়ি, সাদা চুল। চোখ দুটি উজ্জ্বল। স্নেহের সুরে বৃদ্ধ বললেন—"কে তুমি বৎস ? কি তোমার দুঃখ ?"

আইরিহি সব কথা খুলে বললে—"আমার অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনাকে ত কখনও দেখি নি।"

বৃদ্ধ বললেন—"আমি জলদেবতা। এই সমুদ্রেই আমার [illegible] তোমার দুঃখ দেখে এসেছি।"

আইরিহি বৃদ্ধকে প্রণাম ক'রে তাঁর দয়ার জন্যে [illegible] জানালে।

বৃদ্ধ তখন সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে যেন কাকে ইঙ্গিত করলেন। অমনি সাগরের জল থেকে উঠল একটি নৌকো! সোনার হাল, সোনার দাঁড়, সোনার পাল। সবই সোনার। কিন্তু দাঁড়ে নেই দাঁড়ি, হালে নেই মাঝি। নৌকো আপনি এল ভেসে, লাগল তীরে।

বৃদ্ধ বললেন—"ওঠ এই নৌকোয়। চোখ বুজে ব'সে থাক পাটাতনে। উঠলেই নৌকো চলবে। যতক্ষণ না থামে চোখ খুলোনা যেন। তা' হ'লে ভয় পাবে। [illegible] সাগরের যে রাজা, নৌকো লাগবে তাঁর দেশে। তাঁর [illegible] কন্যা—দুইজনই খুব সুন্দরী। কিন্তু ছোট রাজকন্যার মন [illegible] বড় নরম, ফুলের মত। কারও দুঃখের কথা শুনলেই তার চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠে। তার সাহায্যে তোমার হারানো বঁড়শি পাবে। কিন্তু সাবধান, বড় রাজকন্যা ভারী হিংসুটে, তার কাছে এসব কথা ব'লো না কিছুই। সে যদি শোনে তা'হ'লে অনেক বাধা দেবে। এমন সময় কি একটা পাখী শিস্ দিতে দিতে ঠিক আইরিহির মাথার উপর দিয়ে [illegible] গেল। আইরিহি মাথা তুললে—দেখলে আকাশ [illegible] হ'য়ে এসেছে, সকাল হয় হয়। তখনই সে জলদেব[illegible]

[illegible]বার জন্যে মুখ ফেরালে। কিন্তু কই? আশে [illegible] প্রাণী নেই। শূন্য সৈকত। সাদা বালির অনন্ত শয্যা। একদিকে সীমাহীন তরঙ্গময় সমুদ্র, অন্যদিকে ধূসর দুর্গম পর্ব্বত। মধ্যে বালুবেলা। কোথায় তার শেষ, কোথায় বা তার আরম্ভ—কে জানে?

কিন্তু ভাবনার সময় নেই। নৌকো তখনও দাঁড়িয়ে আছে, তারই অপেক্ষায়। উঠে' পড়ল সে সোনার নৌকোয়। চোখ বুজে বসল পাটাতনে। বায়ু-বেগে নৌকো চলতে লাগল, ঢেউ ভেঙ্গে আর জল কেটে।

কতক্ষণ যে এমনি ক'রে কাটল—সে জ্ঞান তার নেই। নৌকো যখন থামল, একটা ধাক্কা লেগে তার চমক ভাঙ্গল। [illegible] দেখে একটি সুন্দর দ্বীপ। আইরিহি নেমে পড়ল নৌকো থেকে, কিন্তু যাবে কোথায়? লোকজন কেউ কোথাও নেই যে জিজ্ঞেস করে। তাই সে আপন মনে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এল একটি গাছের তলায়। এমন গাছ সে কখনও দেখে নি। রূপার গাছ, তা'তে জড়িয়ে আছে সোনার লতা। মুক্তার ফলে গাছের ডাল পড়েছে নুয়ে। সেই গাছের তলায় একটি কুয়ো। কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ তার জল। [illegible]র ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, জল দেখে তার তেষ্টা আরও [illegible] কিন্তু খাবার ত উপায় নেই। জল তুলবে কি দিয়ে?

সে ভাবলে যে, এ কুয়োর জল যখন এমন সুন্দর তখন লোকে নিশ্চয় এ জল খায়। অপেক্ষা করলে নিশ্চয় কেউ না কেউ জল তুলতে আসবে। ততক্ষণ এক কাজ করা যাক। এই গাছটার উপরে উঠে' একটু বসি। এই ব'লে সে উঠে' ব'সে রইল গাছের উপর।

যায় যায়—অনেকক্ষণ যায়। তেষ্টায় গলা কাঠ হ'য়ে গেল। কিন্তু কই, কেউ ত আসে না! তবে কি এদেশে কেউ নেই?

এমনি ভাবছে, এমন সময় কি একটা শব্দ বাতাসে ভেসে এল। মুখ তু'লে দেখল, কয়েকটি মেয়ে কথা বলতে বলতে এই দিকেই আসছে। তাদের সকলের হাতেই একটি ক'রে সোনার কলসী। রঙিন বেশ-ভূষায় তাদের দেহ সজ্জিত। আইরিহি ঠিক বুঝতে পারলে না—এরা কে। তবে এরা যে জল নিতে আসছে এই কুয়োর দিকেই—তা'তে আর কোন সন্দেহ রইল না।

দেখতে দেখতে তা'রা এসে পৌঁছল কুয়োর ধারে। তখন তাদের কথাবার্ত্তা আইরিহির কানে এল। বুঝল এরা রাজকন্যা নয়। তাঁদের সহচরী।

একজন বলছে—"ভাই, বড় সখীর জন্যে ভাবি [illegible] সে যেমন হিংসুটে তার বরও তেমনি হ'লেই চলবে। [illegible]

খারাপ লোকের ত অভাব নেই। তার বরের জন্যে মহারাজের ভাবতে হবে না।”

আর একজন বললে—“তা’ যা’ ব’লেছিস, সই। কিন্তু ছোট সখীর কথা একবার ভেবেছিস কি? হাসি হাসি মুখখানি। আমাদের সকলকে ঠিক বোনের মত দেখে। কখনও একটু জোরে কথা বলে না। আহা তবু বেচারি দিদির মন পেলে না। তার জন্যেই ভাবনা। এমন রত্ন কার হাতে পড়বে!”

তৃতীয় সহচরী বললে—“মহারাজ যাই বলুন না কেন, যার তার হাতে ছোট সখীকে আমরা কিছুতেই দিতে দেব না। বানরে কি মুক্তার মালার মর্ম্ম বুঝে?”

কথা বলতে বলতে অনেকক্ষণ কাটল। সে খেয়াল তাদের ছিল না। হঠাৎ একজন ব’লে উঠল—“গল্প করতে করতে কতক্ষণ কাটল সে দিকে কারও নজর আছে কি? নে নে চল। জল তু’লে প্রাসাদে ফিরতে হবে ত? ছোট সখী একলা আছে—সেটা কি তোরা ভুলে গেলি?”

সবাই বললে—“তাই ত। গল্পে গল্পে কতক্ষণ কেটে গেছে। চল্ চল্ জল তুলে বাড়ী ফিরি।” এই ব’লে তা’রা সোনার কলসে রূপার দড়ি বাঁধলে। বেঁধে ডুবালে কুয়োর জলে। কিন্তু যেই কুয়োর পাড়ে দাঁড়িয়ে জলের দিকে মাথা

ঝুঁকিয়েছে, অমনি সবাই একসঙ্গে চম্‌কে উঠল। চমকে উঠার কারণ আর কিছু নয়। কুয়োর স্বচ্ছ জলে সবাই দেখলে রাজপুত্র আইরিহির ছায়া। প্রথম ভয় কেটে যেতে একটু সামনে গিয়ে তা'রা তাকালে উপর দিকে। ভাবলে কে এ আগন্তুক? কোন্ দেশে এর বাস?

আইরিহি তাদের অবস্থা বুঝতে পেরে বললে—"আমি এক রাজপুত্র। সাগরতীরে আমার বাস। তোমাদের ছোট্ট রাজকুমারীর দেখা পেতে চাই। জলদেবতা স্বয়ং আমাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সে সব কথা পরে হবে। আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত। আমাকে একটু জল দাও।"

সখীরা অমনি সোনার বাটিতে ক'রে রাজপুত্রের হাতে জল দিলে। আইরিহি জল খেয়ে বাটিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললে—"তোমাদের উপকার আমি কখনও ভুলব না। তোমরা আজ আমার প্রাণ দিয়েছ।"

তা'রা বললে—"রাজকুমার প্রাসাদে চলুন। সেখানেই আমাদের সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আপনার মত অতিথি পেলে মহারাজ খুসী হবেন।"

আইরিহি বললে—"না, তোমরা প্রাসাদে ফিরে যাও। সময় হ'লে যাব। এখনও আমার যাবার সময় হয় নি।"

বাটিটা যখন আইরিহি ফিরে দেয় সখীরা সেটা ভাল

আমাকে একটু জল দাও

ক'রে দেখে নেয় নি। পথে যেতে যেতে একজন বললে—"ওরে বাটিতে ওটা কি বল দেখি?"

সকলে বললে—"কি দেখি?"

বাটিতে ছিল একটা মাণিক—সাত রাজার ধন যার দাম—সেই মাণিক। সখীরা ভাবলে—'জল খাবার সময় হয় ত কোন রকমে রাজপুত্রের গলা থেকে মাণিকটি পড়েছে খসে। আমরা সেটা নিয়ে চলে এলাম। তিনি না জানি কি ভাববেন! তা'রা ঠিক করলে মাণিকটা রাজপুত্রকে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। কিন্তু একি? মাণিক যে তোলা যায় না। বাটির গায়ে এমন ভাবে আটকে গেছে যে, সবাই মিলে চেষ্টা ক'রেও সেটা খুলতে পারলে না।

তখন রাজপুত্রের কাছে আর ফিরে না গিয়ে তা'রা এল ছোট রাজকন্যার কাছে। ছোট রাজকন্যা সব শুনে বললে—"দেখি ত কেমন মাণিক!" কিন্তু ব'লেই কেমন যেন তাঁর লজ্জা করতে লাগল। মুখ চোখ তাঁর লাল হ'য়ে উঠল। সখীরা অলক্ষ্যে তাই দেখে একটুখানি মুখ টিপে হাসল।

যাই হোক তবু রাজকন্যা নিলেন সেই বাটি। মাণিকটিতে তাঁর হাত লাগতেই সেটি গেল খুলে। তিনি সহজেই সেটি তুলে ফেললেন। সখীরা সবাই মিলে প্রাণপণ চেষ্টায় যেটা খুলতে পারে নি, তিনি অনায়াসেই সেটা তুলে

ফেললেন দেখে সকলে বিস্মিত হ'য়ে গেল। ভাবলে—'এর অর্থ কি ?'

এক সহচরী বললে—"কি সখি, তবে মহারাজকে খবর দি ?"

ছোট রাজকন্যা তার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে রাগের সুরে বললেন—"কি খবরটা শুনি ?"

—"যে মহারাজের একটা ভাবনা আজ দূর হ'ল।"

—"কোন্ ভাবনাটা আবার দূর হ'ল ?"

—"কোন্ ভাবনা আর ? কিছুই যেন বোঝেন না উনি ! তেমনি বোকা মেয়ে কি না।"—ব'লেই চপলা সখীটি হেসে উঠল। আর সবাই যোগ দিল সেই সঙ্গে।

মহারাজ সমুদ্রনাথ সেই সবে রাজসভার কাজ সেরে বিশ্রামের জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। সংবাদ পেয়েই মহারাণীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এলেন ছোট রাজকুমারীর ঘরে। তিনি হ'লেন সমুদ্রনাথ। সাত সমুদ্র তের নদী—সব তাঁর চোখে চোখে। দেশ-দেশান্তরের খবর তাঁর নখদর্পণে। তিনি মাণিক দেখেই বুঝলেন,—এ মাণিক কার। অদৃশ্য অক্ষরে লেখা ছিল তা'তে নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের নাম। মহারাজের মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'আঃ বাঁচলাম, যার খোঁজ করছি এতদিন ধ'রে আজ সে এসেছে নিজেই। ভগবান তবে মুখ তুলে চাইলেন বোধ হয়।'

তিনি স্বয়ং বেরিয়ে পড়লেন রাজকুমারকে অভ্যর্থনা ক'রে আনতে। সঙ্গে সঙ্গে চলল সভাসদ পারিষদ। পিছনে পিছনে ভীড় ক'রে চলতে লাগল অন্যান্য রাজপরিজনেরা।

রাজা এলেন সেই কুয়োর পাড়ে। তাঁর বেশভূষা দেখেই আইরিহি বুঝেছিল ইনিই রাজা। জলদেবতা এঁর কন্যার কথাই তা'হ'লে তা'কে ব'লেছিলেন। আইরিহি নামল গাছ থেকে। সভাসদেরা জানিয়ে দিলে, স্বয়ং সাতসাগরের রাজা এসেছেন তা'কে প্রাসাদে নিয়ে যেতে। আইরিহি রাজাকে প্রণাম করলে। রাজা তা'কে হাত ধ'রে তুললেন। তারপর তা'কে পরম:সমাদরে নিয়ে এলেন নিজের প্রাসাদে।

রাজ-অতিথি আইরিহি আছেন রাজপ্রাসাদে। আদর যত্নে মাসখানিক তাঁর কাটল। সাগরদ্বীপে কাণাঘুষা শোনা গেল আইরিহির সঙ্গে ছোট রাজকন্যার বিয়ে।

একদিন সত্যি সত্যি বিয়ে হ'য়ে গেল। সে কি ধূমধাম ! সে কি জাঁকজমক ! সাত সমুদ্র তের নদীর যত অধিবাসী সবাই ত এক রাজার শাসনে। সবাই পেলে নিমন্ত্রণ। সবাই নিয়ে এল আপন আপন সাধ্যমত উপহার রাজকন্যার বিয়ের উপলক্ষ্যে। এল তিমি—ত্রিশ হাজার মণ তেল নিয়ে। এই তেলে জ্বলবে আলো। এল কুমীর—অসংখ্য রত্ন নিয়ে। রত্নাকর বলে সমুদ্রকে। তার তলায় রত্নের অভাব ত নেই। কুমীর ডুব দিয়ে এনেছে—মণি-মাণিক্য রাশি রাশি। ছোট রাজকন্যার অঙ্গে জ্বল্ জ্বল্ করতে লাগল সেই সব রত্নাভরণ। এল হাঙ্গর—শৈবালের শাড়ী নিয়ে। কি সুন্দর সেই কাপড়ের বুনানি, কি অপরূপ তার কারুকার্য্য ! জরির কাজ করা রেশমি শাড়ীও তার কাছে হার মানে। সখীরা রাজকন্যাকে পরিয়ে দিলে সেই কাপড়।

বিয়ের পর বর-ক'নে বেরুলেন দ্বীপ পরিক্রম করতে জলহস্তীর পিঠে চ'ড়ে। সামন্ত শঙ্খরাজ নিয়েছেন বাদ্যের ভার। তাঁর হুকুমে বেজে উঠল জলতরঙ্গের সুমধুর ধ্বনি।

প্রবাল সমুদ্র-রাজের রাজমিস্ত্রী। তিনি নিয়েছেন বাসর

নির্ম্মাণের ভার। কি অপরূপ ভাস্কর্য্য সে বাসরঘরের! সে ঘরে জ্বলছে হীরার বাতি। মাণিকের পালঙ্কের উপর ঝুলছে চাঁদের আলোর মত শুভ্রবর্ণ মুক্তার চাঁদোয়া। মৎস্য-কন্যা ও নাগনন্দিনীরা চামর হাতে দাঁড়িয়ে আছেন বর-ক'নের প্রতীক্ষায়। মুক্তাঝুরির হ্রদ থেকে এসেছেন রাণী কমলমণি পুষ্পসম্ভার নিয়ে অসংখ্য রকমের। ফুলের গন্ধে বাসরঘর আমোদিত।

দ্বীপ পরিভ্রমণ ক'রে এসে বর-ক'নে প্রবেশ করলেন সেই বাসরঘরে। শঙ্খরাজের হুকুমে বাদ্যকরেরা নূতন রাগিণীতে ধরলে গান। বেজে উঠল নূতন তালে কাড়া-নাকাড়া।

বছর তিনেক গেল কেটে সুখে-স্বচ্ছন্দে। দাদার কথা আইরিহি একরকম ভুলেই গিয়েছিল। হঠাৎ একদিন সে স্বপ্নে দেখলে হিনোদেকে। এক নিমেষে সব কথা তার মনে পড়ল। ধড়মড় ক'রে সে উঠে' পড়লে বিছানা থেকে। রাজকন্যারও ঘুম ভেঙ্গে গেল। বললে—"কি হ'ল?"

আইরিহি বললে—"না, কিছু না।" তার মুখ ভারি, স্বর করুণ। রাজকুমারী বললে—"নিশ্চয় তোমার মনে কিছু দুঃখ আছে। আমার কাছে গোপন ক'র না। বল হয় ত বা আমি কিছু করতে পারি।"

তখন আইরিহি বললে—"নিতান্তই যদি শুনতে চাও ত

শোন।" ব'লে সে গোড়াথেকে শেষ পর্য্যন্ত সব কথাই খুলে বললে।

রাজকন্যা শুনে বললে—"এই কথা? তা' এতদিন বল নি কেন? এই আমি চল্লুম বাবার কাছে—কালই ফিরে পাবে তোমার দাদার বঁড়শি।"

সম্রাট্ সমুদ্ররাজ মেয়েব মুখে সব কথা শুনে পরদিন সকালেই সভা ডাকলেন। সে সভায় তলপ পড়ল মৎস্যখণ্ডের অধিবাসীদের। তা'রা সবাই এল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। কে জানে মহারাজের কি হুকুম হয়?

মৎস্য দেশের প্রজামণ্ডলী উপস্থিত হ'লে মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন—"তিন বৎসর আগে আমার জামাই ধরছিলেন মাছ—এই সাগরের তীরে ব'সে। তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর বঁড়শি নিয়ে গেছ—কাল রাত্রে এই সংবাদ এল আমার কাছে। কার কাছে সেই বঁড়শি আছে জানতে চাই।"

সভা নিস্তব্ধ। সবাই কেবল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। কিন্তু একটি কথাও কেউ বললে না। হঠাৎ বুড়ো বোয়ালের নাতি লাফ দিয়ে উঠে' বললে—"মহারাজ, আমার দাদামশায় বড্ড বুড়ো হ'য়েছেন ব'লে আসতে পারেন নি। তাঁর বদলে আমাকেই পাঠিয়েছেন—সভায় হাজিরা দেওয়ার জন্যে। আজ তিন বছর হ'ল তাঁর গলায় কি একটা যেন

আটকে আছে। কিছু খেতে গেলেই লাগে। তবে সেটা ঠিক বঁড়শি কি না—জানি না। মহারাজ যদি হুকুম করেন একবার রাজবৈদ্যকে নিয়ে যাই—তিনি যদি অস্ত্রোপচার ক'রে দেখেন, তা' হ'লেই বোঝা যাবে গলায় কি লেগে আছে।"

হুকুম পেয়েই রাজবৈদ্য গেলেন বুড়ো বোয়ালের বাড়ী। খুব সাবধানে তিনি বোয়ালের গলায় করাত চালিয়ে দিলেন। দেখা গেল সত্যিই তার গলার এক কোণে বিঁধে রয়েছে একটা লোহার কাঁটা। কবিরাজ ফিরলেন বঁড়শিটি নিয়ে রাজপ্রাসাদে।

আজ সকাল থেকেই আয়োজন চলেছে—রাজকুমার ফিরে যাবেন দাদার কাছে। সাগরের তীরে এসে লেগেছে সাতখানি. নৌকো। যেটিতে বর-ক'নে যাবে সেটি চমৎকার সাজান—দেখলে চোখ জুড়ায়।

সকাল থেকে রাণী-মা শয্যা নিয়েছেন। আদরের মেয়ে চিরদিনের মত ছেড়ে চলল—এই ভেবে মহারাজের চক্ষুও শুষ্ক ছিল না। বড় রাজকুমারী—যে ছোটবোনকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না, সেও আজ বালিশের উপর উপুড় হ'য়ে কেঁদে আকুল।

ছোট রাজকন্যা তার কাছে এসে বসলেন। ধীরে ধীরে তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। বললে,—"মাপ

কর দিদি, তোমায় কত কটু কথা ব'লেছি, কত কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সে সব কথা ভুলে যেও। ছোট বোনটি ব'লে সব দোষ ক্ষমা ক'রো।"

বড় রাজকন্যা আর পাবলেন না। বোনকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। বললেন—"বোন্, তুই ত কখনও কোন দোষ কবিস্ নি ভাই। আমিই ত তোকে চিরদিন যন্ত্রণা দিয়েছি। স্বামীর বাড়ীতে গিয়ে তুই সুখী হ'—এই আশীর্ব্বাদ করি।"

সাগরতীরে ভাবী ভীড়। মহারাজ মহারাণী এসেছেন মেয়ে জামাইকে বিদায় দিতে। এসেছে পাত্র-মিত্র কোটাল—এসেছে সেপাই-সান্ত্রী—এসেছে লোক-লস্কর—এসেছে পাইক-বরকন্দাজ, আর এসেছে রাজকন্যার সহচরীরা সজল চোখে বিরস মুখে। আর সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে পাষাণ প্রতিমার মত কে ওই মেয়েটি? ও আব কেউ নয়—বড় রাজকন্যা। চোখের জলে আজ তার মনের ময়লা সব ধুয়ে গেছে। আহা কি করুণ তার মুখখানি!

বিদায়ের পালা সাঙ্গ হ'ল। নৌকো ছাড়ার আগে মহারাজ জামাইয়ের হাতে দিলেন দুটি নীলকণ্ঠ মণি। ব'লে দিলেন—"এর একটিতে আনে জোয়ার—অন্যটিতে ভাঁটা। দরকার হ'লে এদের কাজে লাগিও। জোয়ার মণি হাতে নিয়ে যদি

বল 'জোয়ার', অমনি শুকনো মাটিতে বন্যা বইবে। আর ভাঁটা মণিটি হাতে ধ'রে যদি বল 'ভাঁটা', অমনি অথৈ জলও শুকিয়ে যাবে—দেখতে পাবে শুকনো মাটি।" আইরিহি রত্ন দুটি যত্ন ক'রে বেঁধে রাখলে।

আইরিহি ফিরল পাতার কুটীরে। এসেই দাদাকে দিলে তার বঁড়শিটি—আর দিলে তার যৌতুকের অর্দ্ধেক। কিন্তু হিনোদের ঈর্ষ্যা হ'ল আইরিহির ঐশ্বর্য্য দেখে। সে খুসী হ'ল না মোটেই।

আইরিহি এসে নূতন ক'রে আর একটি কুটীর তৈরী করলে নিজের জন্যে। সেইখানেই সে বাস করতে লাগল।

আইরিহি চাষ করে নীচের মাটিতে পাহাড়ের তলায়। হিনোদে করে উপরে, পাহাড়ের গায়ে। বছরের শেষে আইরিহির গোলা শস্যে পূর্ণ হয়, কিন্তু হিনোদের দুঃখ ঘোচে না, তার গোলা শূন্য থেকে যায়। তখন হিনোদে বলে—[illegible] জমি তোমার নয়, আমার। তুমি যাও উপরের [illegible] করগে।" আইরিহি তা'তেই রাজি হয়।

কিন্তু ফল হয় একই। আইরিহির চেষ্টায় পাথরেও সোনা ফলে। হিনোদের ভাল জমিতেও শস্য ফলে না!

হিনোদে নিষ্ফল আক্রোশে নিজেই জ্বলে পুড়ে মরে। একদিন সে মনে মনে ভাবলে যে আইরিহি নিশ্চয় কোন মন্ত্র

এসেছে। সেই মন্ত্র দিয়ে নিজের জমিতে শস্য ফলায়, আর তার জমির উর্ব্বরতা দেয় কমিয়ে। তা'কে মেরে ফেললে হিনোদের আর কোন্ দুঃখ থাকবে না। এই ভেবে সে করলে কি না—একটা তরোয়াল নিয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে রইল আইরিহির কুটীরের পাশে। উদ্দেশ্য—আইরিহি যেই বেরোবে [illegible] অমনি বসাবে তার ঘাড়ের উপর এক কোপ। ব্যস্ [illegible]ন আর কি ?

দাদার ব্যবহারে আইরিহির মনে সর্ব্বদাই একটা ভাবনা ছিল। সে যতই তার ভাল করতে যায়, হিনোদে ততই তার অনিষ্ট করে। তাই সে নীলকণ্ঠ মণি দুটি সব সময় হাতে হাতে রাখত—ডান হাতে জোয়ার মণি আর বাঁ হাতে ভাঁটা মণি।

সেদিনও সে মণি দুটি হাতে ক'রে বেরিয়েছে কুটীর থেকে। [illegible] যে হিনোদে দাঁড়িয়ে আছে দরজার গোড়ায়। তা'কে [illegible]নোদে ওঠালে অস্ত্র। কিন্তু হাত আর নামাতে হ'ল না। আইরিহি ডান হাত তুলে ডাক দিলে—"জোয়ার।" কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলে গর্জ্জন করতে করতে সমুদ্র এল ছুটে। স্রোতে ভেসে গেল হিনোদে। কিন্তু সে জল আইরিহির গায়েও লাগল না। আইরিহি দেখতে পেল, হিনোদে স্রোতের মুখে ভেসে চলেছে ডুবতে ডুবতে। [illegible]জের মনেই দয়া হ'ল। সে বাঁ হাত তুলে

বললে—“ভাঁটা।” আবার মুহূর্ত্তের ম.
যেখানে যা’ ছিল সব ঠিক তেমনি আছে। কেবল হিনোদে
হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে দূব থেকে।

হিনোদে কাছে এসেই ভাইকে জড়িয়ে ধ’রে বললে—

“আমায় মাপ কর্ আইরিহি। আমি হিংসা ক’রে তোকে সারা-জীবন কষ্ট দিয়েছি। তুই একটি কথাও না ব’লে সব সহ্য করেছিস্। আজ আমার জ্ঞান হ’য়েছে। বুঝতে পেরেছি—বয়সে ছোট হ’লেও মন তোর কত বড়। কিন্তু

দাদার কথা শেষ করতে দিলে না। ... করুক না কেন তবু তো সে বড় ভাই। আইরিহি ছোটভাই হ'য়ে তা'কে দণ্ড দিয়েছে। এতে আইরিহি নিজেই মনে মনে অনুতপ্ত হ'য়েছিল। হিনোদের কথা শুনে তার অনুতাপ আরও বাড়ল।

সে বললে—"দাদা, ছোট ভাই ব'লে আমার সব অপরাধ ক্ষমা ক'রো।" তার মুখ দিয়ে আর কথা বেবোল না।

হিনোদে তা'কে বুকে জড়িয়ে ধ'রে বললে—"আজ থেকে আবার আমাদের নূতন ক'রে জীবন সুরু হ'ল। সুখে-দুঃখে ... ভাই ভাই। আনন্দে-বিষাদে আমরা ভাই। ভায়ের মত ...জন আব কে আছে জগতে। সে ভাইকে দুঃখ দিয়েছি এতদিন। আজ ভুল ভাঙ্গল।"

আইরিহি বললে—"ভাইয়ের হাতে দুঃখ পেয়েছও তো অনেক। ভুল শুধু কি তোমারই? তা'তো নয়! আমিও ভুল ক'রেছি ঢের।"

হিনোদে বললে—"আজ আর ওসব কথা নয়। ভুলের পালা শেষ হ'য়ে গেছে।" চল্ এখন আনন্দ করা যাক্।

আইরিহি বললে—"চল দাদা, আজ আমার কুটীরে তোমার নিমন্ত্রণ।"

হিনোদে বললে—"নিমন্ত্রণ কিরে? এবার থেকে এক

কুটীরেই ত বাস করব। তবে কুটীরটা তৈরী [illegible]
একটু বড় ক'রে।"

পিছন থেকে কে যেন ব'লে উঠল—"সে ব্যবস্থা আমিই ক'রে দেব বাবা। কিন্তু তার আগে ত সংসারী হ'তে হবে।"

দু'জনেই চমকে উঠল। চেয়ে দেখল দু'জনেই। রাজার মত বেশ-ভূষা, রাজার মত সব সাজ-সজ্জা একজন বৃদ্ধ। আর তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে—মুখটি লজ্জায় রাঙা।

আইরিহি দেখেই চিনতে পারল—বৃদ্ধ হচ্ছেন সমুদ্ররাজ—তার শ্বশুর। আর মেয়েটি—বড় রাজকুমারী।

তারপর কি হ'ল? সে কথা আর বলব না।

সমাপ্ত